

ডেঞ্জারাস

– জিদনী

ওই শাড়িটা দেখি।

আমি চমকে উঠলাম। দুজনে এক সঙ্গে একই শাড়ির দিকে আঙুল তুলেছি। ছেলেটিও চমকে উঠলো।
নিজেকে সামলে নিয়ে সেলসম্যানকে বললাম, ওই শাড়িটা নামান।

সেলসম্যান দ্বিধায় পড়ে গেল। কাকে দেখাবে শাড়ি?

আমি ছেলেটির দিকে তাকিয়ে কিছুটা অনুরোধের সুরে বললাম, দেখুন, শাড়িটা আমার ভীষণ পছন্দ
হয়েছে। আপনি যদি কাইভলি অন্য কোনো...

ছেলেটি হাসি মুখে বললো, বেশ তো, ও রকম আরেকটা শাড়ি নিয়ে নিন?

কিন্তু সেলসম্যান আতিপাতি খুজেও ও রকম কোনো শাড়ি পেল না। আমি জেদ ধরেছি, ওই শাড়ি
আমি নেবোই। আশ্চর্য! ছেলেটিরও একই জেদ!

শেষ পর্যন্ত ছেলেটি বললো, ঠিক আছে এই শাড়ি এখানে থাক। চলুন আমরা আরো কটা দোকান
দেখি। এ রকম শাড়ি পেলে একটা আমি নেবো, একটা আপনি।

যদি না পাই তখন? প্রশ্ন করলাম।

তখন কেউ-ই এ শাড়ি নেবো না। আমিও না, আপনিও না।

কি আর করা! বাধ্য হয়ে মেনে নিলাম। আট দশটা দোকান ঘুরে অবশেষে সেই শাড়ি পাওয়া গেল।
এরই মধ্যে জানা হয়ে গেছে, ছেলেটির নাম রবিন, থাকে ধানমন্ডি, ইত্যাদি। ছেলেটিও অবশ্য আমার
নাম ঠিকানা জেনে নিল। যাওয়ার আগে ফোন নাম্বার দিয়ে বললো, আপনারটা?

আমি দেবো না দেবো না, করেও শেষ পর্যন্ত কি ভেবে ফোন নাম্বার দিয়ে দিলাম।

এরপর রবিনের সঙ্গে প্রায়ই ফোনে কথা হতো। স্পষ্ট করে না বললেও আকার-ইঙ্গিতে সে প্রায়ই
আমাকে বিভিন্নভাবে অফার দিতো। আমিও আকার-ইঙ্গিতে সম্মতি জানাতাম। কিন্তু আমরা কেউ-ই
স্পষ্ট করে কিছু বলতাম না।

একদিন রবিনের বাসায় ফোন করলাম। আমি ফোন করলে সাধারণত রবিনই ফোন ধরে। কিন্তু
সেদিন ধরলো অন্যজন। বললাম, রবিন আছে?

জি না, উনি তো বাসায় নেই। আপনি কে বলছেন?

উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, আপনি কে বলছেন?

আমি তার ছোট ভাই রনি।

ও আচ্ছা। রবিন এলে বলবে, আমি ফোন করেছিলাম।

কিন্তু আপনি কে?

আমি কিছু না বলেই ফোন রেখে দিলাম। ছেলেটির সঙ্গে কথা বলার পর থেকে আমার মাথায় চিন্তার
ঝড় বয়ে যাচ্ছে। বাসায় আমার বিয়ের কথা চলছে। আমি এটা ওটা বলে ঠেকিয়ে রেখেছি রবিনের
জন্য। যার নাম এবং ফোন নাম্বার ছাড়া কিছুই জানি না। মা বাবা যদি বিয়ের ব্যাপারে চাপ দেয়?

জানতে চায় কেন বিয়ে করছি না? কি বলবো? রবিনের কথা! কিন্তু তার ব্যাপারে তো তেমন কিছুই জানি না।

এভাবে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের নাগরদোলায় যখন দুলছি তখনই ঘটলো এক অভাবনীয় ঘটনা। বান্ধবীদের সঙ্গে মার্কেটে ঘুরতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি ছয় সাতজনের একটা দল শাড়ির দোকানে ঢুকছে। সঙ্গে রবিনও আছে। দোকানে ঢুকেই তারা বললো, বিয়ের শাড়ি দেখান।

বিয়ে? কার বিয়ে? রবিন তো আমাকে কিছুই বলেনি। তার সঙ্গে এতোদিন ফোনে কথা বললাম, অথচ সে তো আমাকে কিছু বললো না।

তাড়াহুড়ো করে বাসায় ফিরলাম। রবিনদের বাসায় ফোন করলাম। ফোন ধরলো তার সেই ছোট ভাই রনি। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার বড় ভাই আছেন?

না, ভাইয়া তো মার্কেটে।

মার্কেটে?

জি ভাইয়ার বিয়ে তো তাই। কিন্তু আপনি কে?

আমার নাম অনি, অনিমা। তোমার ভাইকে বলবে সে যে বিয়ে করছে এটা আমাকে জানালে কোনো ক্ষতি হতো না।

আর কিছু বলতে পারলাম না। কান্না পাচ্ছিল। বাবা-মায়ের বিরুদ্ধ আচরণ করে, বড়দের সঙ্গে ঝগড়া করে বিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছি কার জন্য? আমি যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছি তার স্বপ্নরাজ্য বিচরণ করছে অন্য কেউ। কিন্তু তাহলে এতোদিন এতো ফোন, এতো গল্প, এতো হাসি এসবের অর্থ কি? নিছক খেলা? আমি কি তাহলে একটা খেলনা?

মাথায় রক্ত চড়ে গেল। আমি সব সহ্য করতে পারি অবহেলা ছাড়া। মাকে বললাম, তোমরা যদি এক সপ্তাহের মধ্যে আমার বিয়ে দিতে পারো, আমি রাজি। তা না হলে আমি জীবনেও বিয়ে করবো না। মা কি ভাবলেন, কি বুঝলেন কে জানে! তিনি হেসে বললেন, ঠিক আছে।

সেদিন রাতে রবিন ফোন করলো। আমি ফোনটা তুলে হ্যালো বলতেই সে কোনো ভূমিকা না করে বললো, তুমি আজ দুপুরে ফোন করেছিলে?

হ্যাঁ।

কি বলেছো?

যা সত্য, তাই বলেছি।

কি সত্য?

ন্যাকামি করো না। কি সত্য? বিয়ে করছো, করো। কিন্তু লুকালে কেন? আমি বাধা দেবো ভেবে? কি মনে করো আমাকে?

বিয়ে করছি? আমি? কবে?

প্লিজ! এনাফ ইজ এনাফ। আর ভনিতা করো না। আমার শ্রদ্ধা তো হারিয়েছোই, ঘৃণা কুড়িও না।

তুমি এসব কি বলছো? আর এক সপ্তাহ পর বড় ভাইয়ার বিয়ে। তোমার একটা টেলিফোনে পুরো বাড়িতে হলস্থূল কাণ্ড শুরু হয়েছে।

বড় ভাইয়া? তোমার বড়ভাইয়ের বিয়ে?

নয়তো কার? আমার?

আমি তো তাই ভেবেছি।

বাহ! এতোদিন কথা বলার পর তোমার মনে হলো তোমাকে ছেড়ে অন্য একজনকে বিয়ে করতে যাচ্ছি? আহা, কি বুদ্ধি তোমার!

আমি লজ্জায় লাল হয়ে গেলাম। সেই সঙ্গে ভয়ও পেয়ে গেলাম। মাকে দুপুরে এক কথা বলেছি। মা নিশ্চয়ই এতোক্ষণে সেটা বাবাকে বলে ফেলেছেন। এখন কি করে বলি যে, আমি...।

রবিনকে সে কথা বলতেই সে হেসে বললো, এটা কোনো ব্যাপারই না। আমি ম্যানেজ করে নেবো।

কিন্তু কেমন করে?

সময় হলে দেখবে। এখন আন্টিকে ফোনটা দাও।

মাকে? তুমি পাগল হলে?

এখনো হইনি। কিন্তু তোমার কাণ্ডকীর্তিতে তার আর বেশি বাকি নেই। তুমি আন্টিকে ফোন দাও।

কিন্তু তুমি...।

কিন্তু আমি কি সেটা পরে শুনবো। তুমি আগে যা বলছি তা করো।

ভয়ে ভয়ে মা-বাবার রুমে নক করে মাকে জাগলাম।

আমার ঘরে নিয়ে এসে বললাম, তোমার ফোন।

মা অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। এরপর আস্তে আস্তে গিয়ে ফোনটা ধরলেন। দ্রুত পায়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে চোখ বুঝে এক মনে আল্লাহকে ডাকতে থাকলাম।

জীবনে আর কখনো এতো একাধি চিন্তে আল্লাহকে ডেকেছি বলে মনে পড়ে না। মা কখন আমার রুম থেকে বেরিয়ে গেছেন, জানি না। তার সঙ্গে রবিনের কি কথা হয়েছিল তাও জানি না।

তবে দুই সপ্তাহ পর যখন রবিনের সঙ্গে আমার এনগেজমেন্ট এবং আকদ একই দিনে হয়ে গেল তখন বুঝলাম, যে কথাই হয়ে থাক না কেন, তার মূল্য কম নয়!

বান্ধবীদের মুখে শুনেছি বিয়ের আগে পাত্রের বাবা-মায়েরা নাকি তেত্রিশ কোটি প্রশ্ন করে। কিন্তু আমাকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলো না। শুধু বড় ভাইয়া বললেন, ডেঞ্জারাস মেয়ে তুমি! নিজের সঙ্গে দিয়েছিলে তো আমার বিয়েটাও ভেঙে।

পুরো ব্যাপারটা এখনো আমার কাছে স্বপ্নের মতো লাগে। বিশ্বাস হতে চায় না। রবিনকে সে কথা বললেই সে আমার হাতে একটা রামচিমটি কেটে বলে, বিশ্বাস হলো?

আরেকটা রাম চিমটি খাওয়ার ভয়ে দ্রুত উপরে-নিচে মাথা দোলাই আর মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাই সেই শাড়িকে যার বদৌলতে আজ রবিন আমার পাশে।

আশকোনা, ঢাকা থেকে

লেখিকাকে পূর্ণ ঠিকানা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। - যাযাদি

শবেবরাতের রাত

– কামরুন্নাহর টগর

চাকরির প্রথম বেতন পেয়ে আমার প্রাণপ্রিয় মায়ের জন্য একটা শাড়ি কিনেছিলাম। আমার মা খুব সুন্দরী ছিলেন। মাকে মানাবে এমন একটা শাড়ি অনেক বেছে কিনেছিলাম। মাকে শাড়িটা দেখালে মা খুশি হলেন। বুঝলাম শাড়িটা মায়ের পছন্দ হয়েছে। কিন্তু মা বললেন, শাড়িটা সুন্দর তবে লাল পাড় যে। তুই তো জানিস, থামে বিধবা মানুষ লাল পাড়ের শাড়ি পরলে লোকে সমালোচনা করবে। বললাম, যে সমালোচনা করবে আমি তার মুখ ভেঙে দেবো। বাবা নেই তাতে কি হয়েছে, তুমি কি বুড়ো হয়ে গেছো?

মা তবুও আমতা আমতা করতে লাগলেন।

বেশ কিছুদিন চলে গেল। মা এখনো শাড়িটা পরছেন না। পরতে বললে বলেন, এটা তুই পরে ফেলিস। পরে আমাকে আরেকটা কিনে দিস।

খুব রাগ হলো এই সমাজের প্রতি, মায়ের প্রতি।

আজ পবিত্র শবেবরাতের রাত। প্রতি বছর এই রাতে মা ও আমি এক সঙ্গে নামাজ পড়ি। এই দিনে মা রোজা রাখেন এবং সন্ধ্যায় গোসল করে কথা না বলে দুই রাকাত নামাজ পড়েন। আজ সন্ধ্যায় গোসল সেরে মা আমার দেয়া নতুন শাড়িটা পরেছেন। মাকে যে কি সুন্দর লাগছে বলার মতো না। মাকে জড়িয়ে ধরে শুধু বললাম, মা, তোমাকে সত্যি লাল পরীর মতো লাগছে।

কথা বলবেন না বলে মা মুচকি হেসে নামাজের ঘরে চলে গেলেন। বুঝলাম সমালোচনার ভয়ে মা হয়তো দিনের আলোতে শাড়িটা না পরে রাতে পরেছেন। হায়রে সমাজ!

দুজনে এক সঙ্গে নামাজ পড়ছি হঠাৎ মা জায়নামাজে ঢলে পড়লেন। হাই ব্লাডপ্রেশার উঠেছে। মা খুব ছটফট করছেন। আমি চিৎকার দিলাম। বাড়ির সবাই ছুটে এলো। কেউ পানি দিচ্ছে, কেউ বাতাস দিচ্ছে। হঠাৎ দেখি মায়ের নাক দিয়ে অনেক রক্ত আসছে। মায়ের শরীর রক্তে লাল হয়ে গেল। এখন আর শুধু পাড় নয়, পুড়ো শাড়িটাই লাল টকটকে।

সত্যি সত্যি যেন মা লালপরী হয়ে গেলেন। আমার মা আর কথা বলতে পারেননি। তার লাল টুকটুকে সুন্দর মুখটা চিরদিনের জন্য নির্বাক, নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

১৯৯১ সালের মায়ের সেই শাড়িটা সযত্নে রেখে দিয়েছি। মায়ের জন্য যখন বুকটা হাহাকার করে তখন শাড়িটা বুকে চেপে ধরলে সত্যি মনে হয় আমি মায়ের বুক। শবেবরাতের রাতে যখন ওই শাড়িটা পরে নামাজ পড়ি তখন মনে হয় মা আমার পাশে নামাজ পড়ছেন। সত্যি সেই শাড়িটায় আজো মায়ের শরীরের পবিত্র গন্ধ পাই যা মাকে আমার কাছে আনে।

সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ থেকে

বিচরণ

– মাহবুব

এইচএসসি ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে এইচএসসি লেভেলের ছাত্রদের জন্য তখন ছাত্রাবাস ছিল দুটি। দুটোর অবস্থাই ছিল করুণ। তার মধ্যে বেশি করুণ ছিল শেরেবাংলা ছাত্রাবাস। দুর্ভাগ্যবশত আমার সিট হয়েছিল ওটাতেই। ভালো ছাত্র ও ভালো ছেলে হিসেবে গ্রামে আমার বেশ সুনাম ছিল। তাই গ্রাম সম্পর্কীয় আমার এক বড়লোক ফুপু যার স্বামী আমেরিকা প্রবাসী আমার বাবাকে বললেন, ছেলেটাকে আমার বাসায় দিয়ে দিন।

যেই কথা সেই কাজ। ফুপুর বাসায় থেকে লেখাপড়া করি এবং মাঝে মধ্যে ফুপুর ছোট বাচ্চা দুটোকে একটু দেখিয়ে দিই। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার কারণে বাচ্চা দুটো নানুর বাসায় বেড়াতে যায়। ফুপু যাবেন তাদের আনতে। খুব সুন্দরী ফুপুকে যে কোনো পোশাকেই ভালো মানায়।

একদিন বাসায় কেউ নেই। ফুপু সর্বাঙ্গে দামি পারফিউম মাখলেন এবং নীল রঙের চমৎকার একটা শাড়ি পরলেন। ফুপু আমাকে তার শোবার রুমে ডেকে নেন। ওনাকে দেখে মনে হয়েছিল একটা ফুটন্ত গোলাপ। জিজ্ঞাসা করলেন, তাকে কেমন দেখায়?

বললাম, খুব সুন্দর।

অনেক কথা বলার পর তিনি আমাকে বললেন, শাড়িটার নিচ দিয়ে একটু টেনে ঠিক করে দাও না।

আমি বুঝতেই পারিনি এটা ছিল ওনার একটা ফাদ। ওপর দিয়ে পেটিকোটের সঙ্গে খুব হালকাভাবে লাগানো ছিল বলে একটু টান দেয়াতেই ওনার দামি শাড়িখানা আমার নাকে মুখে গড়িয়ে পড়লো। কিংকর্তব্যবিমূঢ় আমি ভয়ে কেদে ফেলি। সান্ত্বনা দেয়ার ছলে তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে নেন আর বলেন, বোকা ছেলে, এতো বোকা হলে দুনিয়াতে চলবে কি করে?

সুন্দরী ফুপুর শরীরের ঘ্রাণ, নরম শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আমাকে মাতাল করে তুলছিল। এক পর্যায়ে বললেন, শাড়িটা তো খুলেছো, এবার পেটিকোট এবং ব্লাউজটাও খোলো।

কম্পিত হাতে ওগুলো খুললাম। চোখের সামনে দেখতে পেলাম এক নিরাবরণ পরী। দেরি না করে তিনি হ্যাচকা টানে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমার অদক্ষতা বুঝতে পেরে শিথিয়ে দিলেন কি করতে হবে। আমি তার অধর, নাক, গলা, বুক, তলপেটসহ সর্বাঙ্গ চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলাম।

এক পর্যায়ে মাতাল আমাকে হ্যাচকা টান মেরে কাছে নিয়ে ওনার শরীরের ওপর তুললেন।

অনেকক্ষণ পর শরীর নিস্তেজ হয়ে এলো। নিজকে বিবস্ত্র অবস্থায় আবিষ্কার করলাম, ওনার শরীরের ওপর। তখন লজ্জায় মরি মরি অবস্থা। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়ার পর তিনি অনেক কিছু খেতে দিলেন আর বললেন, মাঝে মধ্যে এভাবে আমার শাড়ি ঠিক করে দিতে হবে এবং এ কথা কাউকে বলা যাবে না।

সেদিন আমি যে মজা পেয়েছিলাম, পরবর্তী কালে নিজ থেকেই এভাবে শাড়ি ঠিক করে দিতাম। এভাবে প্রায়ই শাড়ি ঠিক করতে গিয়ে এইচএসসি-তে খুব ভালো রেজাল্ট করতে পারিনি। ইউনিভার্সিটিতে একটা সাধারণ সাবজেক্টে মাস্টার্স করে একটা প্রাইভেট ব্যাংকে চাকরি নিয়েই তুষ্ট

থাকতে হয়েছে। শাড়ি পরানোই আমার জীবনটা অর্ধেক শেষ করেছে। না হলে আরো ভালো কিছু করতে পারতাম।

ফুপু এখন সপরিবারে আমেরিকা থাকেন। তবে দেশে আসার সময় আমার জন্য অনেক গিফট নিয়ে আসেন এবং সব সময় আমার খোজখবর নেন। এটাই আমার পাওনা। তাছাড়া তিনিই আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে নারীর গোপন রাজ্যে বিচরণ করতে হয়।

জোয়াগ, চান্দিনা, কুমিল্লা থেকে

পাগড়ি

– নুরে আলম

একমাত্র ফুপা আমেরিকায় থাকার সুবাদে মাঝে মধ্যে দেশে আসা-যাওয়া করেন। আত্মীয়স্বজনদের জন্য বিভিন্ন ধরনের উপহারও আনেন। বেশ কয়েক বছর আগে ফুপা তার শ্বশুরের জন্য অর্থাৎ আমার দাদার জন্য একটা পাগড়ি নিয়ে আসেন। পাতলা শাদা কাপড়ের বিশাল বারো তেরো হাত লম্বা ওই পাগড়িতে সুন্দর ছোট ছোট রূপালী রঙের চুমকি বসানো ছিল। শেরওয়ানি পরে পাচ ছয় প্যাচ দিয়ে ওই পাগড়ি মাথায় দিলে এবং লাঠি হাতে রাখলে দাদাকে রীতিমতো জমিদার মনে হতো। ওই অবস্থায় যারাই দাদাকে দেখতেন সকলেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেন। একবাক্যে সকলে স্বীকার করতেন যে, হ্যা, শ্বশুরকে জামাই উপযুক্ত উপহারই দিয়েছেন এবং ওটা একটা পাগড়ি বটে। দশ থামের কারো মাথাতেই ওই ধরনের পাগড়ি কখনিকালেও কেউ দেখেনি।

আমিও দাদার মাথায় ওই পাগড়ি দেখলে রোমাঞ্চিত ও গর্বিত হতাম। ভাবতাম ওই ধরনের পাগড়ি মাথায় বাধতে পারা কি সহজ কথা! ছোটবেলায় মনে হতো নিজ হাতে নিজের মাথায় কখনোই অতো বড় পাগড়ি বাধতে পারবো না।

অবশ্য বড় হবার পর ওটার পরিচয় আমাদের কাছে জানতে পারি। প্রায়ই আশ্চর্য লাগতো এই ভেবে যে, কোনো পাগড়িতে কখনো চুমকি বসানো দেখিনি। কিন্তু দাদার পাগড়িটি ওই রকম ডিজাইনের কেন! পরে ভাবতাম দাদার পাগড়ি বলেই হয়তো ওটা ও রকম।

একবার পাগড়ি সম্বন্ধে এই কৌতূহলের কথা আমাদের কাছে ব্যক্ত করাতে তিনি হেসে জানালেন যে, ওই পাগড়ি তো আসলে পাগড়ি ছিল না, ওটা ছিল একটা শাড়ি। ফুপার মাথা থেকেই এ বুদ্ধি আসে যে, শ্বশুরের জন্য ওই কাপড়টি মানানসই একটা পাগড়ি হবে। তাই তিনি ওভাবেই কাপড়টার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এবং আমেরিকা থেকে আনার কারণে সকলেই তা মেনে নিয়েছিল।

ঝিগাতলা, ঢাকা থেকে

নাড়ি

– কে.এম. সালাহউদ্দিন তিতাস

আমরা তিন ভাই, দুই বোন। আমি সবার ছোট। আমি পহেলা সেপ্টেম্বর ১৯৭৯-এ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদরে মিশন হাসপাতালে জন্মগ্রহণ করি। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করায় আমার নাম তিতাস রাখা হলো। মাকে আমি বড় বেশি ভালোবাসি যা অন্যদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমি তখন অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। আমার দুই আপুরই বিয়ে হয়েছে বেশ কিছুদিন হলো। ছোট আপুর প্রথম সন্তান হওয়াতে প্রায় দেড় মাস হলো আমাদের বাসায় দুলাভাইসহ আপু অবস্থান করছেন। এবং আপু থাকাতে আমাদের বাসার পরিবেশ গল্প ও আড্ডাতে বেশ জমজমাট।

তিনি তার ছেলেকে নিয়ে নানান রকম মজার কথা বলেন। যেমন তার ছেলে দেখতে কেমন হয়েছে? সুন্দর হয়েছে কি না, নাক লম্বা, না বোচা হবে? এরূপ নানান মজার মজার প্রশ্ন প্রতিদিন অন্তত কয়েকবার জিজ্ঞাসা করেন। এখনো প্রায় সময় বাচ্চা মেয়ের মতো একবার একেকটা শাড়ি পরে সবার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, এই, আমাকে এ শাড়িতে কেমন লাগছে বলো তো? মাধুরী, না ঐশ্বরিয়ার মতো? এই সব নানান ধরনের প্রশ্ন।

হঠাৎ আপুর চিংকারে একদিন দুপুরে ঘুম ভেঙে গেল। সে যেন কোনো মহাগুপ্তধন আবিষ্কার করেছেন। দেখি আপু আর আম্মু আমার রুমে এসে হাসতে হাসতে লুটোপুটি খেতে লাগলেন। আমি সেই মুহূর্তে কোনো কিছুই আন্দাজ করতে পারছিলাম না। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করতেই আমাকে বললেন, আমার জন্মের পর খসে পড়া জন্ম নাভিটি যাকে নাড়ি বলা হয় তা পাওয়া গিয়েছে। যা দ্বারা মাতৃগর্ভে আমার মায়ের সঙ্গে আমার সরাসরি সম্পর্ক ছিল। যেই নাড়ি দিয়ে মাতৃগর্ভে আমার চাহিদা পূরণ হয়েছে এবং বর্জ্য অপসারণ হয়েছে। গর্ভে থাকাকালীন যা ছাড়া আমার জন্ম, আমার জীবন বা আমার বর্তমান অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। আমাকে সেই পুরনো শুকনো আমার নাভি বা নাড়িটি দেখাতে চাইলো। আমার চোখের সামনে মেলে ধরলো।

কিন্তু আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম, দেখলাম না। কারণ সেই মুহূর্তে আমার মধ্যে এক ধরনের অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় ছিল এতোদিন এটি।

যা বললেন তা শুনে তাজ্জব হয়ে গেলাম।

আম্মুর বিয়ের শাড়িটি এখনো আম্মু যত্ন করে রেখে দিয়েছেন সাইত্রিশ বছর ধরে। এবং এই শাড়ির আচলের কোণায় বাধা ছিল প্রায় বাইশ বছর ধরে। এতোদিন আম্মুও কখনো এটি খেয়াল করেননি। কারণ সেই শাড়িটি আম্মু বিয়ের পর আর পরেননি। সেদিন ছোট আপু শখ করে শাড়িটা পরতে গিয়ে খেয়াল করলেন আচলের কোণায় বাধা রয়েছে। আম্মুকে দেখাতেই আম্মু চিনে ফেললেন প্রায় বাইশ বছর আগে শাড়ির আচলের কোণায় বেধে রাখা আমার সেই জন্ম নাভিটি।

আমার মনে পড়লো কতো বড় বন্ধনে সরাসরি আবদ্ধ ছিলাম এই নাভিটির মাধ্যমে আমার মায়ের সঙ্গে। এখন নাভিটির মাধ্যমে সরাসরি বন্ধন নেই তা ঠিক কিন্তু তার চেয়ে এখন বেশি বন্ধনে জড়িয়ে

আছি আমার মন দিয়ে। আমার আত্মা, সমস্ত সত্ত্বা, আবেগ, ভালোলাগা, চাওয়া-পাওয়া, রাগ-অভিমান, আবদার, হাসি-কান্না আর আমার ভালোবাসার মাধ্যমে।

আমার যে কোনো সফলতায় যেন তার চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হন না। আমার বিপদের আশংকায় তার চেয়ে বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অন্য কেউ হন না। কারণ সেই নাড়ির মাধ্যমে গড়ে ওঠা নয় মাস দশ দিনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নাড়ি বা নাভি খসে পড়ার পরও যেন অদৃশ্য অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে পরিণত হয়ে আছে, থাকবে অনন্তকাল। এই খসে পড়া নাড়ি বা নাভিটি দেখে আবার অনুভব করলাম কতো বড় বাধনে আমাকে আগলে রেখেছিলেন আমার মা। এবং চিন্তা করলাম ও অবাক হলাম এই ভেবে যে, কতোগুলো বছর এই শাড়িটি আমার ও আমার মায়ের সরাসরি বন্ধনের শেষ চিহ্নটুকু আগলে রেখেছে অতি গোপনে। অবশেষে আমি পেলাম আমার জন্মের সময়ের অবিকৃত আমারই দেহের মমি করা অসংখ্য কোষের সন্ধান।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে দেখি ছোট আপু সারা ঘর তোলপাড় করে কি যেন খুজছেন। জিজ্ঞাসা করতেই বললেন, আমার বাবুর নাড়িটা আমি খুজছি। কোথায় রেখেছি মনে আসছে না। কারণ জানতে চাইতেই আপু বললেন, আম্মুর মতো আমার বাবুর নাড়িটাও আমি যত্ন করে রেখে দেবো। তারপর সে যখন তোর মতো বড় হবে তখন তাকে তার নাড়িটা দেখিয়ে বলবো, এই দেখ, তোর জন্মের সময়ের নাড়ি বা নাভি যেটা দিয়ে তুই মাতৃগর্ভে থাকাকালে তোর সমস্ত সত্ত্বা আমার মাঝে মিশে ছিলি, আর আমাকে জড়িয়ে ছিলি।

সেদিনই আমি চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে অনার্সে ভর্তির জন্য চট্টগ্রাম চলে আসি। কিন্তু এখনো জানা হয়নি আপু তার বাবুর নাড়িটা বা জন্মের পর খসে পড়া নাভিটা খুজে পেয়েছে কি না।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

শাড়িওয়ালা

– লাবনী

এই তো সেদিনের ঘটনা। দুপুরের ঝিমুনি ধরা গরমে আমি আর মা শুয়েছিলাম। দুইজনের মধ্যে কথা হচ্ছিল সংসারের খুটিনাটি বিষয় নিয়ে। এমন সময় বেসুরো শব্দে কলিংবেলটা বেজে উঠলো। চোখে মুখে রাজ্যের বিরজি নিয়ে যেতে হলো দরজা খুলতে। কারণ তখন বাসায় কোনো কাজের লোক ছিল না। দরজা খুলে দেখি সামনে একজন আধো পরিচিত লোক দাড়িয়ে আছেন। হাতে একটি বড়সড়ো ব্যাগ। কেমন চেনা চেনা লাগছে। কিন্তু ঠিক কোথায় দেখেছি তা মনে করতে পারছি না। লোকটি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, খালাম্মা বাসায় নেই?

তাকে দেখেই মা চিনতে পারলেন। তাকে তার খবরাখবর জিজ্ঞাসা করলেন। লোকটি দেখি তার ব্যাগের ভেতর হাত দিয়ে কি যেন খুজছেন। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। মনে মনে চিন্তা করলাম দেশের যা অবস্থা তাতে লোকটি হয়তো চোর ডাকাত হতে পারে। তার ব্যাগের ভেতর নিশ্চয়ই কোনো অস্ত্র

রয়েছে। এখুনি হয়তো অস্ত্র বের করে আমার কিংবা মায়ের মাথায় ঠেকিয়ে বলবে, যা আছে সব দিয়ে দিন।

কিন্তু লোকটি আমাকে অবাক করে দিয়ে দুটো শাড়ি বের করে মায়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটি আপনার জন্য। একদিন আপনি আমার যে উপকার করেছিলেন তার বিনিময়ে ছোট উপহার।

মা শাড়ি নিতে রাজি না হওয়ায় লোকটির মুখের যে করুণ অবস্থা হয়েছিল তা দেখে বাধ্য হলেন শাড়ি দুটো নিতে। পাছে লোকটি ভেবে বসে, গরিব বলে তার দেয়া শাড়ি মা নিচ্ছেন না।

হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল সব কিছু। চিনতে পারলাম লোকটাকে। ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসের ঘটনা। এমনি এক দুপুরে কলিংবেলের আওয়াজে দরজা খুলে দেখি এক শাড়িওয়ালা দাড়িয়ে আছে। মা শাড়ি দেখে লোকটিকে ফিরিয়ে দিলেন। কারণ লোকটি ইনডিয়ান শাড়ি এনেছিলেন। কিন্তু মা ইনডিয়ান শাড়ি পরেন না।

যাহোক, দরজা লাগিয়ে এসে মাত্র বসেছি। কিছুক্ষণ পর আবার কলিংবেল বেজে উঠলো। দরজা খুলে দেখি আবার সেই লোক। একি! লোকটির চোখে পানি, চেহারা উদভ্রান্ত। আমার মাকে দেখে পায়ে পড়ে কাদতে লাগলেন। মা তাকে সব কিছু খুলে বলতে বললেন।

লোকটি বললেন, আমাদের এখান থেকে বের হয়ে যাবার পর কয়েকজন ছিনতাইকারী তার শাড়ির ব্যাগ, টাকা-পয়সা সব ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। এখন তার বাড়ি যাবার টাকাটাও নেই।

বেচারা ইনডিয়া থেকে চোরাই পথে শাড়ি এনে বাংলাদেশে বিক্রি করতো। তাই দিয়ে তার সংসার চলতো। কথায় কথায় জানা গেল তার নাম জন্মস্থান ভারতে কিন্তু এখন সপরিবারে থাকে ঢাকার মিরপুরে। হাজার হোক মায়ের মন। তার কষ্টের কথা শুনে মা গলে গেলেন। তৎক্ষণাৎ তাকে পাচশ টাকা দিয়ে বিদায় করলেন।

এরপর অনেক দিন কেটে গেছে। এখন ২০০২ সাল। লোকটি মায়ের সাহায্য ভুলে না গিয়ে মায়ের জন্য দুটো শাড়ি এনেছিলেন উপহার হিসেবে। কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতে জানালেন, নতুন ব্যবসা দাড় করাতে একটু সময় লাগলো। তাই আসতে একটু দেরি হয়ে গেল।

তার দেয়া শাড়ি হাতে নিয়ে মা দাড়িয়ে রইলেন। লোকটি আর কোনো কথা না বলে চলে গেলেন। আমি এবং মা তার চলে যাওয়া দেখতে লাগলাম।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

তালাক

– মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম হানিফ

শাড়ি, ছোট একটি শব্দ, অথচ মাঝে মধ্যে এ শব্দটি আমার কাছে ভয়াবহ আকার ধারণ করে। শব্দটি শোনামাত্র মাথার ভেতর যন্ত্রণা শুরু হতে থাকে। শপিংয়ে গেলে থরে থরে সাজানো শাড়িগুলো যখন দেখি, আপনাপনি পাগুলো অবশ হয়ে আসে, শরীরের সমস্ত শক্তি উধাও হয়ে যায়।

শিক্ষা জীবন শেষ করে চাকরি নামে সোনার হরিণের পেছনে ছুটে পার করে দিলাম মূল্যবান চারটি বছর। মামা চাচা না থাকায় ভালো ইন্টারভিউ দেয়া সত্ত্বেও চাকরি হলো না। যখন হতাশার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেলাম, একজনের বদান্যতায় একটি প্রাইভেট ফার্মে শিক্ষানবীশ হিসেবে খুব স্বল্প বেতনের একটি চাকরি পেলাম। ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে চাকরিতে যোগ দিই।

২০০০ সালের জানুয়ারি মাসে মামাতো বোন সনি আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসে। অনেক দিন পর তাকে দেখে পুলকিত হই। কেননা তাকে ছোটবেলায় দেখেছিলাম। দেখে মনে হলো সৃষ্টিকর্তা নিজে হাতে মেয়েটিকে গড়েছেন। আমাদের বাড়ির সবাই মেয়েটির রূপে মুগ্ধ। আমার মন বললো, এই মেয়েটির জন্ম হয়েছে আমার জন্য। পনেরো দিনের মতো আমাদের বাসায় ছিল। এই কদিন আমি ছিলাম একটা ঘোরের মধ্যে। তাকে মনে হতো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবী। সে চলে গেল। লাজুক টাইপের ছেলে হওয়ায় তাকে কিছুই বলা গেল না। বাড়িতে জানালাম। সবাই আপত্তি তুললো। আমার মা জানিয়ে দিলেন, এ মেয়ে বিয়ে করে আমি সুখী হবো না। কেননা মেয়েটি নাকি প্রচণ্ড অহঙ্কারী।

মা আরো জানালেন যে, রূপ তার অহঙ্কার শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। মেয়ের বাবা দেশের বাইরে থাকায় অন্য মামাদের ধরলাম, খালাদের জানালাম। তারাও মায়ের মতোই কথা বললেন। পাগল হয়ে গেলাম। প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে যাই না। দুই একদিন পর পর ছুটে যেতাম তার কাছে। এক ঝলক দেখেই চলে আসতাম। কিছুই বলতে পারতাম না। সে সবই বুঝতো, কিছু বলতো না। আহর নিদ্রা ত্যাগ করলাম। স্বাস্থ্য খারাপ হতে শুরু করলো। অবশেষে সবাই আমার ভালোবাসার কাছে হার স্বীকার করলো। ২০০০ সালের ৭ মে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। কথা রইলো, তিন চার বছর পর লেখাপড়া শেষ হলে মেয়েকে উঠিয়ে আনা হবে। ততোদিন সে বাবার বাড়িতে থেকেই লেখাপড়া করবে।

বিয়ের বাজার করেছিলেন আমার বড় ভাই। বাবা অবসর নেয়ার পর সংসারের হাল ধরা স্বল্প শিক্ষিত ভাইটি আমাকে ভীষণ ভালোবাসতেন। কনের কসমেটিক, জামা, জুতা সবই পছন্দ হলো শুধু শাড়িটা আমার কাছে পছন্দ হলো না। মাকে খুলে বললাম। মা জানালেন, এই শাড়িটা ফেরত দেয়া মানে বড় ভাইয়ের পছন্দকে অসম্মান করা। আমিও তাই ভাবলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম বিয়ের পর পরই তাকে একটা ভালো শাড়ি কিনে দেবো।

বিয়ের পর মেয়ে নিজেদের বাড়িতেই ছিল। কদিন পর গেলাম তাকে দেখতে। সে কাছে এলো না। মামির কাছে জানতে পারলাম শাড়ি পছন্দ না হওয়ায় সে ভীষণ রেগে আছে। মামি অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে আমার কাছে নিয়ে এলেন।

এসেই প্রথমে যে কথাটি জানালো তা হলো, জীবনে সে এতো বাজে শাড়ি দেখেনি। বিয়েতে যে এতো বাজে শাড়ি দেয় তার মনটাও বাজে হতে বাধ্য। ফকিরের বিয়েতেও এর চেয়ে ভালো শাড়ি দেয়।

কান্না চেপে বাড়ি চলে এলাম।

পরের মাসে বেতন পেয়ে তাদের বাসায় গেলাম। তাকে মার্কেটে নিয়ে যেতে চাইলাম শাড়ি কেনার জন্য। সে যেতে রাজি হলো না। মামি বকাঝকা করে আমার সঙ্গে পাঠান। মার্কেটে গিয়ে সে যে শাড়ি পছন্দ করলো তা আমার দুই মাসের বেতনের সমান। প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে শাড়ি কিনে

দিতে পারলাম না। সে রাগ করে আমাকে ফেলে চলে এলো। বাড়িতে এসে সব জানালাম। দুই পরিবারে বিবাদ দেখা দিল। পরবর্তী আট নয় মাস তাদের বাসায় গেলাম না।

২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নানির অসুস্থতার খবর পেয়ে দেখতে গেলাম। সেখানে অনেকের মাঝে স্ত্রী সনিও ছিল। অনেক দিন পর তাকে দেখে মাথা খারাপ হয়ে গেল। তার সঙ্গে কথা বলতে চাইলাম। সে আমাকে পাত্তাই দিল না। তাকে অনুরোধ করলাম, হাত ধরে কাদলাম। মন গললো না। হঠাৎ কি যে হয়ে গেল, প্রচণ্ড জোরে একটা চড় মেরে বসলাম তার গালে।

মার্চ মাসের ১২ তারিখে তার তালাকনামা আমার হাতে এসে পৌঁছালো। আমার পরিবার জোর করে তালাকনামায় আমাকে সই করালো।

আজ অনেক দামি শাড়ি কেনার সামর্থ্য আমার হয়েছে। শুধু সে নেই।

জাজিরা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা থেকে

জন্মদিনে

– ফারহানা আফরোজ

আমার জীবনের প্রথম শাড়ির আনন্দ, বেদনা ও তৃপ্তির কথা। ঘটনাটি ছিল আমার উনিশতম জন্মদিনের। আমার ওই জন্মদিনে চার পাচজন বান্ধবী ও তিনজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম এ তিনজনের মধ্যে একজন ছিল আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু বা প্রেমিক। নিমন্ত্রিতরা যথাসময়ে সবাই হাজির এবং কেক কাটা দিয়ে অনুষ্ঠানের কাজ ও অনেক হাসি-তামাশা দিয়ে শেষ হয়। সে রাতে আমার বান্ধবী রুমা আমাদের বাসায় থেকে গিয়েছিল এবং রাতে আমার পাওয়া গিফটগুলো আমরা দুজনে মিলে একে একে খুলে দেখলাম। সব শেষে খুললাম আমার ইয়ের প্যাকেটটি। খুলে তো চোখ ছানাবড়া। তার দেয়া প্যাকেটে ছিল খুব সুন্দর একটি নীল শাড়ি ও ম্যাচ করা শাড়ি পরার যাবতীয় উপকরণ।

তখনই মাথায় এলো দুষ্টুমি বুদ্ধি, রুমাকে বললাম, রুমা, শাড়িটা যখন সান্ধির দিয়েছে তখন সান্ধিরই শাড়িটা পরিয়ে দিক। রুমাও আমার কথায় রাজি। বড় সমস্যা দেখা দিল কোথায় গিয়ে শাড়ি পরবো।

আমার ভাগ্য ভালোই হোক আর খারাপই হোক সমস্যার সমাধান দিল রুমা। রুমার আবু ও বড় ভাই আগামী সপ্তাহে তাদের থামের বাড়ি যাবে। তখন রুমার বাসায় সান্ধিরকে ডেকে সব আয়োজন করা হবে।

যেই কথা সেই কাজ। নির্দিষ্ট দিনে সান্ধিরকে ডাকা হলো রুমার বাসায়। কথা ছিল বিকাল চার ত্রিশ মিনিটে আসার। কিন্তু কোনো অজানা কারণে সে আসে সন্ধ্যা ছয়টার সময়। এসে অনেক অনুনয়-বিনয় করে ক্ষমা চাইলো। আমিও উদার চিন্তে তাকে ক্ষমা করে দিলাম। তারপর সে জানতে চাইলো কেন তাকে এখানে ডাকা হয়েছে। তাকে বললাম, আমার জীবনের প্রথম শাড়িটা তুমি দিয়েছো তাই

তোমাকেই পরিয়ে দিতে হবে। যদিও সে প্রথমটায় রাজি হচ্ছিল না। পরবর্তী কালে আমার ইচ্ছার কাছে হার মেনে রাজি হয়েছিল। কিন্তু আমিও ভাবিনি শাড়ি পরতে গিয়ে আমার এমন অবস্থা হবে। সে একে এসে আমার কামিজ, টেপ, ব্রা, সর্বশেষ সাপোয়ার খুলে ফেলে। কিন্তু ওই সামান্য সময়ের মধ্যে ঘটে গেল আমার জীবনের স্বর্ণীয় একটি ঘটনা। যখন সে আস্তে আস্তে করে সব খুলেছিল তখন আমার শরীরে হেটেছিল এক কোটি পোকাকার শিহরণ। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে ছেড়ে দিলাম সাদিরের নিয়ন্ত্রণে।

সাদিরের শরীরেও যে তেত্রিশ হাজারের ভোলটেজ ছিল তাও বুঝতে পারছিলাম তার তপ্ত নিঃশ্বাসে। মন বাধা দিতে চাইলেও শরীর কিছুতেই বাধা দিল না। উপরন্তু সাদিরের শরীরের কাছে নিজেকে আরো সুন্দর করে সপে দিলাম। এক সময় আমাদের এক জোড়া শরীর এক হয়ে মিশে গেল একটি শরীরে। থেমে গেল সমস্ত শারীরিক যুদ্ধ, রয়ে গেল কিছু কিছু স্মৃতি চিহ্ন।

আর লিখতে চাই না সেই তৃপ্তিদায়ক রাতের কথা। যদিও কোনো কারণবশত তার সঙ্গে আর কখনো রাত কাটানো হয়নি। কেননা নিয়তির নির্মম পরিহাসের ওই ঘটনার কিছুদিন পর আমার বাবা অন্য একজন বিদেশ ফেরত ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দিল। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং সেই স্বামী নামে পুরুষটির সঙ্গে একই মশারির মধ্যে কতো শতবার শুয়েছিলাম। কিন্তু ওই রাতের মতো তৃপ্তি বা আনন্দ কোনো কিছুই পাইনি।

পাঠক বা পাঠিকা আপনারা হয়তো ভাবছেন আমি কতো খারাপ। তবে আমি তো সত্যি কথাই লিখলাম। যদি এই লেখা আপনাদের ভালো লাগে তাহলে ভাববো আপনাদেরও অনুভূতি আছে। আর যদি ভালো না লাগে তাহলে ক্ষমা করে দেবেন।

নিরালা, খুলনা থেকে

অসম্ভব

– অন্তবিহীন

আমাদের বায়োলজি ম্যাডাম লিটাআপার জন্য তীব্র পাগল ছিলাম। তাকে আমার প্রচণ্ড ভালো লাগতো। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হলেও তার ক্লাস কখনো মিস করতাম না। দারুণ স্মার্ট সেজে কলেজে আসতেন তিনি। সবচেয়ে সুন্দর ছিল তার শাড়ি পরার স্টাইল। আমরা ছেলেরা তো বটে, মেয়েরা পর্যন্ত তার শাড়ির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আর তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সব সময় ফাস্ট বেঞ্চে বসতাম। অন্য ক্লাসের সময় কমন রুমে আড্ডা দিলেও বায়োলজি ক্লাসের সময় ঠিকই হাজির।

প্রথম প্রথম ম্যাডাম আমাকে পাত্তা দিতেন না। আগ বাড়িয়ে পরিচয় দিলেও তিনি না চেনার ভান করতেন। তবুও হাল ছাড়িনি। ক্লাসে সবাই আমার ম্যাডাম প্রীতিটা জানতো। অথচ ক্লাসে আমাকে পছন্দ করতো লাইজু। আমি যেমন ম্যাডামকে দারুণ পছন্দ করি তেমনি আমাকে ও পছন্দ করতো। কিন্তু ম্যাডাম প্রেমে বিভোর আমি তাকে মোটেও পাত্তা দিতাম না।

এদিকে আমাদের সেকশনের পিকনিকের দিন লাইজু শাড়ি পরে এসেছে। আমাদের কো-গাইড লিটা ম্যাডামও শাড়ি পরে এসেছেন। ইনডিয়ান সিল্কের ম্যাচ করে শাড়ি পরা দেখে আমার জীবনানন্দ দাশের সেই কবিতার লাইনটির কথা মনে পড়ে গেল –

সেখানে রূপসী নারীর শরীর জড়িয়ে আছে হলুদ শাড়ি।

লাইজু প্রচণ্ড ঘৃণা করতো ম্যাডামকে। কারণ আমি। সেদিন পিকনিকে লাইজু ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু অপমান করে ম্যাডামকে। ম্যাডাম যখন লাইজুর প্লেটে রোস্ট দিচ্ছিলেন তখন লাইজু সেই রোস্ট ছুড়ে ফেলে দেয় মাটিতে। সবাই হতবাক তার আচরণে। ম্যাডামকে বিব্রত হতে দেখে, আমি রাগের মাথায় লাইজুকে গিয়ে থাপ্পর মারি।

পরিণতিতে আমাদের মাঝে প্রচণ্ড ঝগড়া। লাইজু আমার হাত কামড়িয়ে রক্ত বের করে। ম্যাডাম তখন দূরে দাড়িয়ে আমাদের ঝগড়া দেখছেন। আর লাইজু ম্যাডামকে শুনিয়ে আমার প্রেমের কথা চাউর করতে থাকে। লজ্জায় ম্যাডামের দিকে তাকাতে পারি না।

পিকনিক থেকে ফেরার পর এক সপ্তাহ ক্লাসে যাইনি। একদিন ক্লাসের বিল্টু এসে খবর দিল, ম্যাডাম আমাকে দেখা করতে বলেছেন। শুনে তো আমি হতবাক। যাবো কি যাবো না, সাত পাচ ভেবে গেলাম তার বাসায়। কলিংবেল-এর আওয়াজ শুনে ম্যাডামই গেট খুললেন। আমাকে দেখে তার ভুবন বিখ্যাত হাসিটি দিলেন। লজ্জা ও আড়ষ্টতায় নিজেকে গুটিয়ে তাকে সালাম দিলাম। ভেতরে আসতে বললেন আমাকে। ভেতরে গিয়ে আমি অবাক। কারণ ভেতরে লাইজু বসা। আমাকে বসতে বললেন। তারপর আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কি খবর?

আমি উত্তর দিলাম।

তিনি বলে গেলেন, লাইজু তোমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে, তুমি জানো?

হ্যাঁ।

তুমি জানো!

আমি নিরুত্তর।

শোনো, লাইজু খুব ভালো মেয়ে, ব্লিয়ান্টও। সে তোমাকে ভালোবাসে এটা জানার পর তাকে রেসপন্ড করা তোমার উচিত ছিল।

আমার আরেকজনকে ভালো লাগে।

সেটা জানি। কিন্তু সেটা কি সম্ভব?

আমি চোখ তুলে তার দিকে তাকালাম।

মুখে তার হাসি। বললেন, ভালোলাগা আর ভালোবাসা এক জিনিস নয়। তাই নয় কি? আচ্ছা বলো তো আমার কি ভালোলাগে তোমার কাছে?

ম্যাডাম, আপনার শাড়ি পরা খুব ভালো লাগে। মনে হয় খুব রূপসী আপনি। হয়তো কোনো উপন্যাসের নায়িকা। ওকে আমার পিচ্চি পিচ্চি লাগে।

শোনো, শাড়ি পরলে যে কোনো মেয়েকে বড় বড় লাগে। তুমি লাইজুকে শাড়ি পরাও দেখবে সেও উপন্যাসের নায়িকা হয়ে যাবে।

তারপর তিনি আমার ও লাইজুর মধ্যে বাধন গড়ে দেন। তার শাড়ি কালেকশন থেকে লাইজুকে শাড়ি উপহার দিলেন। লাইজু ম্যাডামকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাদলো। আমিও কাদলাম তবে গোপনে। আর সে কান্না ছিল কি যেন হারানোর বেদনায়।

রিকশায় উঠে লাইজু আমাকে বললো, পিকনিকের দিন আমি জীবনের প্রথম শাড়ি পরেছিলাম, তোমাকে দেখবো বলে। সেদিন তুমি আমাকে মেরেছিলে। আবার যদি শাড়ি পরি তুমি কি আমাকে মারবে?

তার দিকে চেয়ে মাথাটা আমার বুকের সঙ্গে মেশাতে মেশাতে বললাম, না। কিন্তু তাকে বললাম না কারণটা।

কারণ ওই শাড়িতে যে আমার প্রিয় ম্যাডামের স্পর্শ লেগে আছে!

ঢাকা থেকে

স্বর্গসুখ

ক্লান্ত দেহটা নিয়ে বুঝলাম বিয়ের শাড়ির তলে এতো কষ্ট! কোনোমতে উঠে গিয়ে কাজের মেয়েটাকে বললাম, বিয়ে করা এতো কষ্ট তা জানলে বিয়ে করতাম না।

মাত্র কয়েকদিন হঠাৎ এমন আকর্ষণ পেয়েছিলাম স্বামীর তলে থেকেই বলে উঠলাম, বিয়ে করা এতো মজা তা জানলে আরো আগে বিয়ে করতাম।

তিন মাসেই দুনিয়ার যতো রকম গেম সব শিখিয়ে স্বামী আমার চলে গেল বিদেশ। এদিকে একা ঘরে মাথা আমার ঘুরতে থাকে গেমের নেশায়।

তোমাকে না দেখলে বুঝতামই না ট্রেনগরী কেন ধ্বংস হয়েছিল। তুমি এ যুগের ক্লিওপাত্রা। তোমাকে না দেখলে বুঝতামই না কেন রাজারা রাজ্য ছেড়েছে যুগে যুগে নারীর কারণে।

কথাগুলো আমার ফ্ল্যাটের দোতলায় রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স পড়া এক ছেলে বেড়াতে এসে আমার দিকে হা করে চেয়ে থেকে কিছুদিন আগে বলেছিল।

একদিন বান্ধবীর সঙ্গে হাটছি, পেছন থেকে শুনতে পেলাম, একদিনের জন্য হলেও তোমাকে বিয়ে করেই ছাড়বো।

ছেলেদের অত্যাচারে আমার পড়াশোনা অর্থাৎ বাইরে যাওয়া কঠিন হয়ে গেলে হঠাৎ করে পাত্রপক্ষ দেখতে এসে তাদের চাপে কলমা পড়া হয়ে গেল।

কিন্তু স্বামীর সঙ্গে বাইরে বের হলেও শান্তি নেই। হা করে তাকিয়ে থাকে, ব্যাডসাইন্ড দেয়। মনে মনে ভাবি, ছেলেগুলোর দোষ কি, তারা তো বুঝতেই পারে যে, পাশে আমার স্বামী। এ অবস্থায় দিন দিন আমার প্রতি বিরক্ত হতে লাগলো স্বামী।

একদিন স্বামী ক্ষেপে কফি কালার সানগ্লাস কিনে বললো, যখন রাস্তায় বের হবে তখন এটা পরবে যাতে ছেলেরা তোমার চোখ দেখতে না পায়।

মাত্র আড়াই বছরে বুঝলাম আমার স্বামীর দৌড় শেষ, ঝিমামোর পালা তার এসে গেছে। আমাদের বিয়েটা ছিল অসম। আমার স্বামীর বয়স আমার চেয়ে বিশ বছর বেশি। সে দশ বছর বিদেশ কাটালো। আসে আবার চলে যায় তিন বছর পর।

মা আমার দুঃখ করে বলেন, অতি বড় ঘরনী না পায় ঘর, অতি বড় সুন্দরী না পায় বর।

এখনো আমার বিয়ের প্রস্তাব আসে।

এখন আমি তিন চার হাজার টাকা দামের দামি আমেরিকান স্প্যানিশ মখমল বেডশিটে দামি নাইটি পরে শুয়ে ভাবি যদি ছেড়া শাড়ি আর কুড়ে ঘরে থেকেও স্বামী সুখ পেতাম!

স্বামী আমার নাক ডাকে পাশের রুমে। আমার রাজপুত্রের মতো সুন্দর ছেলেটাকে চুমু দিয়ে ভাবি, ভাগ্যিস ছেলে হয়েছিল। না হলে সুন্দরীর দোষে আমার মতো...।

মেয়েদের বলছি, সুন্দরী হওয়ার দোষে বড়লোক স্বামীর ঘরে যাবার আগে চিন্তা করে নিন এসব সম্পদ করতে গিয়ে তার যৌবনের অর্ধেকই কেটে গেছে... শেষে দুই ঠ্যাং দাড়ায় তো মধ্যের ঠ্যাং...।

গাড়ি-বাড়ি, দামি শাড়ি নয়, শাড়ির তলেই যে স্বর্গসুখ সেটা মনে রাখবেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

ঢাকা থেকে

পছন্দ

– মোহাম্মদ আমিনুল এহছান সেলিম

পাবনা জেলায় সমবায় বিভাগে চাকরি করি। বাড়ি কুড়িগ্রাম জেলা শহরে। বিভিন্ন বিভাগের ছয়জন চাকরিজীবী প্রায় ছয় বছর যাবৎ পাবনা শহরের দিলালপুর এলাকায় সমবায় ব্যাংক ভবনে মেস-এ থাকি। ছয়জনই ব্যাচেলর। বাধা ও চিন্তাহীন জীবন খুব সুন্দরভাবে কেটে যাচ্ছি। আমি ছিলাম মেসের ঘোষিত আজীবন মেস ম্যানেজার। প্রতিটি বিষয়েই আমার মতামত বা সিদ্ধান্তকে মোটামুটি সবাই স্বাগত জানাতো। তাছাড়া আমার ব্যক্তিত্ব দিয়েও সেটা অর্জন করতে পেরেছিলাম। সেই প্রেক্ষিতে মেসের এলাকায় আমার নিজস্ব একটা সুনাম গড়ে ওঠেছিল। ফলে এলাকায় যাদের বিয়েযোগ্য মেয়ে ছিল তাদের বাড়িতে প্রায়ই নিমন্ত্রণ পড়তো। জীবনের প্রায় প্রতিটি দিনকে মনে হতো বসন্ত। ভাবনাহীন জীবনের মজাই আলাদা। কিন্তু আমার এই ভাবনাহীন জীবনে বাবার অকস্মাৎ মৃত্যু নতুন চিন্তা, কষ্ট ও দুঃখ এনে দিল। জীবনের হিসাব নতুন করে শুরু করলাম। মৃত্যুর আগে বাবার বড় বৌ দেখতে ইচ্ছার সক্রিয় মুখটি আমার চোখে বার বার ভেসে উঠতে থাকে। বিবেকের যন্ত্রণায় আতকে উঠি, মায়ের একাকীত্ব দূর করার জন্য বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিই।

১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে অফিস থেকে বেশ কয়েকদিনের ছুটি নিই। দুই বন্ধুসহ মোটর সাইকেলে গ্রামের বাড়ি চিলমারিতে বেড়াতে যাই। এলাকার ইসমাইল চাচাকে বিয়ের কথা বলাতে তিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পাশে একটি মেয়ের সন্ধান দেন। তিন বন্ধু তখনই মেয়েকে দেখার সিদ্ধান্ত নিই। ইসমাইল চাচার সহযোগিতায় মেয়ের চাচার বাসায় অনানুষ্ঠানিকভাবে মেয়েকে দেখি এবং

তিনজনেই মেয়েকে পছন্দ করি। বাড়িতে এসে মাসহ বড় বোন ও দুলাইভাইকে বিষয়টি জানাই। অবশেষে অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ সালে বিয়ে রেজিস্ট্রি হয়। বাবার চেহলাম অনুষ্ঠান না হওয়ায় চেহলাম অনুষ্ঠানের পর বিয়ের অনুষ্ঠানের দিন নির্ধারণ হয়। বিয়ে রেজিস্ট্রি হওয়ার পর কর্মক্ষেত্র পাবনায় চলে আসি। বিয়ের শপিং নিয়ে ভাবনা শুরু হয়। কি কি কেনাকাটা করতে হবে, বিয়ের কাপড় কতো টাকার মধ্যে কিনলে প্রেস্টিজ যাবে না, কসমেটিকস কোন দেশের তৈরি নিতে হবে এই নিয়ে চিন্তা করার ফলে রাতে ঘুম না হওয়ায় হাই প্রেশার দেখা দিল। আমার এই কষ্ট দেখে স্থানীয় ছেলে ও মেসমেশ্বার রেনাটা ওষুধ কম্পানিতে চাকরিরত সোহাগ সাহ্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে চিন্তা করতে নিষেধ করলো। ছুটির দিন বিকেলে লিটন এবং আমাকে সোহাগ মেসের পাশে তার ভাবী, বড় বোন, এবং ভাতিজির সঙ্গে পরিচয় করে দিয়ে আমার সমস্যার কথা বলে। সিদ্ধান্ত হয় প্রতি শনিবার বিকেলে ভাবীকে বাসা থেকে নিয়ে শপিং করবো। ভাবী আমার হবু স্ত্রীর শারীরিক গঠন ও গায়ের রঙ জেনে নেন। আমরা শপিং শুরু করি।

স্বপ্নের দিন ঘনিয়ে আসে। বর সেজে দুরু দুরু বুক ও মনে ভয় নিয়ে স্বশুরবাড়ি চিলমারিতে যাই। অপেক্ষা করতে থাকি ভাবীর কষ্ট করে কেনা লাল কাতান পরে আমার হবু বধূ কখন আমার সামনে আসবে। সময় যেন শেষ হতে চায় না। অবশেষে সময় আমার কাছে পরাজিত হলো। ছোট খালা ও খালাতো বোন আমার হবু বধূকে যখন আমার সামনে উপস্থিত করলো আমি তার রূপ দেখে তখন অভিভূত। চোখের পলক যেন পড়তেই চায় না। আমার সামনে একটি জীবন্ত পরী লাল কাতানে আমার হবু বধূকে সত্যিই পরীর মতো মনে হয়েছিল। আনুষ্ঠানিকতা শেষে কৌশলে আমার এক শ্যালিকাকে আমার কেনাকাটা পছন্দ হয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করাতে জানতে পারি আমার কেনাকাটা তাদের খুবই পছন্দ হয়েছে।

মন থেকে কিছুটা চিন্তা দূর হয়ে যায়। রাত দশটায় নববধূকে নিয়ে কুড়িগ্রাম নিজ বাড়িতে আসি। পারিবারিক কিছু খোজখবর নিয়ে অনেক রাতে আমার সদ্য বিয়ে করা স্ত্রীর কাজে তার কুশলাদির খোজ নিয়ে শুয়ে পড়ি। সাতাশটি বসন্তের সকল ভালোবাসা এক করে পরম মমতা নিয়ে আমার বধূকে কাছে নিয়ে কানে কানে জিজ্ঞাসা করি, আমাকে পছন্দ হয়েছে?

লজ্জায় রক্তে রাঙা লাল গোলাপের মতো মুখটি নিয়ে আমার সদ্য বিবাহিতা বধূ বললো, জানি না।

আবার তাকে নিবিড় মমতায় জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করি, আমার শপিং তোমার পছন্দ হয়েছে?

তার উত্তরে সে আমার কানে মুখ নিয়ে ফিস ফিসিয়ে বললো, খুব পছন্দ হয়েছে।

লাফিয়ে বিছানায় উঠে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে ভাবীর কথা স্মরণ করি। ধন্যবাদ ভাবী, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

কুড়িগ্রাম থেকে

অপ্রত্যাশিত

– বনানী

আমার শাড়ির ঘটনাটা বলার আগে আমার আত্মার সম্পর্কে একটা ধারণা দিচ্ছি। কারণ শাড়ির গল্পটি আত্মাকে নিয়ে।

আত্মা খুব মিত্যব্যয়ী ছিলেন, বিশেষ করে কাপড়-চোপড় কেনার ব্যাপারে। তিনি অনেক বড় একটা চাকরি করতেন এবং সে সুবাদে প্রায়ই তাকে পাকিস্তানে করাচি, লাহোর, ইসলামাবাদ যেতে হতো। অনেক বড় বড় কনফারেন্সে আত্মাকে মধ্যমণি হওয়ার সাফল্যের কথা তার সহকর্মীদের শুনতে হতো। আত্মা যে এতো বড় একটা চাকরি করতেন, এতো যে দেশ-বিদেশে যেতেন তবুও তার মাত্র দুই সেট সুট আর দুই তিন জোড়া শাদা শার্ট ও কালো প্যান্ট ছিল। কনফারেন্স শেষে আত্মা পাকিস্তান থেকে আমাদের জন্য কাঠের বাক্স বোঝাই করে প্লেনে এক্সট্রা ভাড়া দিয়ে আপেল, নাশপাতি, আঙুর, বেদানা আনতেন। কিন্তু কখনো সাটিন, জর্জেট, নাইলন কাপড় কিংবা সোনা-রূপার গহনা আনতেন না। দামি কাপড়-চোপড় কেনাটা আত্মা অপচয় মনে করতেন। এ জন্য আত্মার সঙ্গে খালারা রাগারাগী করতেন। কিন্তু এ নিয়ে আমার মায়ের মনে কোনো ক্ষোভ ছিল না।

আমরা যখন ছোট ছিলাম, আত্মা আমাদের ছয় ভাইবোনকেই ঈদে, পর্বে সুতির জামা-কাপড়ই দিতেন।

বিয়ের পাচ বছর পর আশির দশকে আমার মেয়ে হয়। স্বাভাবিকভাবেই মেয়েকে কিভাবে সাজাবো, কি করবো না করবো এ নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। যখনই ঢাকা যেতাম, নিউ মার্কেট, বায়তুল মোকাররম ঘুরে সুন্দর ডিজাইনের ফ্রক কিনতাম। আত্মা রাগ করতেন। বলতেন, এই যে একশ, দেড়শ টাকা দিয়ে এই ছোট ছোট ফ্রক কিনেছো তা কি তোমার মেয়ে একশ দেড়শ দিনও পরতে পারবে? এ তো দুদিন পরেই ছোট হয়ে যাবে।

আমার মেয়ে যে আত্মার নাতনি হয় সে খেয়ালটুকুও থাকতো না। আমি অভিমানে মুখ ভার করতাম।

আত্মা হা হা করে ছুটে এসে বলতেন, আহা, থাক না। সে নিজে চাকরি-বাকরি করে, তাই শখ করে কিনেছে। তুমি আবার এ নিয়ে কথা বলছো কেন?

সেই বাবার কথাই আপনাদের বলছি। ১৯৯২ সালে সপ্তাহ খানেক ট্রেনিং উপলক্ষে ঢাকা যাই। ছেলেমেয়ে দুটিকে আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের বাবা ও কাজের বুয়ার কাছে খুলনা রেখে আসি। ঢাকায় বাবার বাসায় উঠি।

ট্রেনিং শেষে বাচ্চাদের জন্য একটু কেনাকাটা করি। এ সুযোগে নিজের জন্য একটা শাড়ি কিনবো ভেবে দোকানে যাই। একটা শাড়ি পছন্দ হলো। হালকা সোনালি রঙ-এর ফুল, সিল্কের ওপর পুরোটা কাথা স্টিচের কাজ। দোকানি দাম চাইলো পাচ হাজার টাকা। শুনেই ভড়কে গেলাম। হাতে এতো টাকাও ছিল না। কিছুটা মন খারাপ করেই ফিরে আসি। পরদিন খুলনা চলে আসবো তাই গোছগাছ করছি আর আত্মার সঙ্গে কথা বলছি।

আত্মা, একটা শাড়ি পছন্দ হয়েছিল কিন্তু কিনতে পারলাম না।

কেন? মায়ের প্রশ্ন।

এতো দাম যে তুমি চিন্তাই করতে পারবে না।

কতো দাম?

পাচ হাজার টাকা।

পাশের ঘর থেকে আশ্বা এ ঘরে এসে বললেন, কি, এই কথা? আমার মেয়ে একটা শাড়ি পছন্দ করবে আর তা কিনতে পারবে না? কতো দাম তোমার শাড়ির?

আশ্বা পাশের ঘর থেকে আমাদের কথা শুনে ফেলেছেন জেনেই চুপসে গেছি। কারণ আগেই বলেছি, কাপড়-চোপড় কেনার ব্যাপারে অনেক টাকা খরচ করাটা আশ্বা বিলাসিতা মনে করতেন। আর আমি কি না আমার সঙ্গে দামি শাড়ি কেনার ব্যাপারে আফসোস করছিলাম। তখনি আশ্বা জেনে ফেলেছেন। তাই আশ্বার কথার কি জবাব দেবো, না দেবো ভাবছিলাম। এমন সময় আশ্বা আবার বললেন, কি মা, বললে না শাড়ির দাম কতো?

আমি আশ্বার প্রথম সন্তান ও একমাত্র মেয়ে হওয়ার সুবাদে ওনার সঙ্গে অনেক ফুলি কথা বলতাম। তাই বললাম, আশ্বা, এটা মায়ের শাড়ি না যে, দুইশ তিনশ টাকা দাম। এই শাড়ির অনেক দাম।

কতো দাম? এক হাজার, দুই হাজার, তিন হাজার, কতো?

আশ্বা, ওই শাড়ির দাম পাচ হাজার টাকা।

মাত্র পাচ হাজার টাকা? আশ্বা তখনি আলমারি খুলে পাচ হাজার টাকা এনে আমার হাতে দিলেন যা কি না একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল।

আমতা আমতা করে বললাম, আশ্বা, আমি এখন বড় হয়েছি। নিজে চাকরি করছি। এখন কি আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে শাড়ি কেনা ঠিক?

আশ্বা আমার কাছে সরে এলেন। বললেন, দেখি, দেখি তুমি কতো বড় হয়েছো? বলে আশ্বা আমার মাথাটা ওনার বুকে চেপে ধরলেন। কপালে একটা চুমু দিয়ে বললেন, মাগো, তুমি যতো বড় চাকরিই করে না, আমার কাছে এখনো সেই ছোটটিই রয়ে গেছো। এটা একটা কথা হলো? আমি বেচে থাকতে আমার মেয়ে একটা শাড়ি পছন্দ করবে অথচ কিনতে পারবে না? তুমি আর একটি কথাও না বলে শাড়িটা নিয়ে এসো।

শাড়িটা কিনে এনে আশ্বাকে দেখালাম। আশ্বা খুবই খুশি হলেন। পরদিন সকালে খুলনা আসার জন্য রওনা হওয়ার আগে আশ্বাকে সালাম করে দাড়িয়েছি। পরনে সেই শাড়িটা।

আম্মাকে বললেন, দেখো, দেখো শাড়িটা আমার মাকে কেমন মানিয়েছে। গায়ের রঙ-এর সঙ্গে মিশে গেছে।

আশ্বা হিসাবি ছিলেন ঠিকই কিন্তু আমি তার প্রাণ ছিলাম। ফলে আমার শখটুকু মেটানোর জন্য আশ্বা এই অপব্যয়টুকু করেছিলেন।

আশ্বা মারা গেছেন আট বছর হলো। এখনো আলমারি খুলে অনেক শাড়ির ভিড়ে আশ্বার দেয়া সেই শাড়িটা দেখে চোখ ভিজে যায়। মনে হয় আশ্বা বুঝি এখনই বলে উঠবেন, দেখি, দেখি তুমি কতো বড় হয়েছো?

খালিশপুর, খুলনা থেকে

বাকিতে

- দীপু

মা, বোন, ভাবী কাউকেই শাড়ি কিনে দেয়া হয়নি। আর বিয়ে যেহেতু করিনি তাই বৌকেও দিতে পারিনি। তবে একবার এক ম্যাডামকে শাড়ি উপহার দিয়েছিলাম। আমি তখন ডেমক্রেসিওয়াচ-এর ছাত্র। আমাদের ইংরেজির ম্যাডাম ছিলেন ফরিদা হক। আমরা ছিলাম আটত্রিশ ব্যাচ-এর ছাত্র। আমাদের কোর্স যখন শেষ তখন আমরা সবাই সিদ্ধান্ত নিলাম ম্যাডামকে কিছু উপহার দেবো। সবাই নির্দিষ্ট হারে টাকা দিলাম। টাকা তোলা এবং উপহার কেনার দায়িত্ব পড়লো আমার ওপর। উপহার কেনার দিন আমার সঙ্গে গেল পলিন, শান্তা, সোমা এবং আরো দুইজন মেয়ে। মেয়েদের নিলাম। কারণ মেয়েরা বললো, ম্যাডামকে শাড়ি উপহার দেবে।

আমরা প্রথমে গেলাম কর্ণফুলি গার্ডেন সিটি-তে। ওখানে শাড়ির দোকান ঘুরে পছন্দ হলো না। ওখানে আমার বোন জামাই-এর শাড়ির দোকান আছে। এবং ঢাকার আরো কয়েকটি বড় মার্কেটে দোকান আছে। দুলাভাইয়ের দোকান আবার বিখ্যাত। এরপর গেলাম ইস্টার্ন প্লাজা। সেখানে বড় দোকানটা আবার আমার দুলাভাইয়ের। সেখানে গিয়ে একটা শাড়ি মেয়েরা পছন্দ করলো। পছন্দ তো হলো কিন্তু সমস্যা হলো, আমাদের বাজেটের চেয়ে শাড়ির দাম বেশি। তারপর আমার পরিচিতির কারণে আমাদের সব টাকা দিয়ে কিছু টাকা বাকি রেখে শাড়ি কিনলাম। এরপর শেষ ক্লাসে আমরা সবাই ম্যাডামকে শাড়ি উপহার দিলাম।

ম্যাডাম শাড়ি দেখে পছন্দ করলেন এবং আমাদের সবাইকে উপহারের জন্য ধন্যবাদ দিলেন। আমাদের সঙ্গে ক্লাসে আরো ছিল জাওয়াদ, পারভীন জাকারিয়া, রেমন, মুনিয়া, সুমন, শুজি, লিটা ও কঙ্কন। সেই সঙ্গে ডেমক্রেসিওয়াচের আটত্রিশ ব্যাচের সবাইকে প্রিয় যায়যায়দিনের মাধ্যমে শুভেচ্ছা।

অনেক দিন হলো কারো সঙ্গে দেখা নেই। শান্তা, গনি ও পারভীন জাকারিয়া হয়তো এখন আমেরিকা প্রবাসী। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, শাড়ি কিনতে কিছু টাকা বাকি ছিল সেটা এখনো পরিশোধ করা হয়নি। আমার কপাল খারাপ, কাউকে প্রথম শাড়ি উপহার দিলাম সেটাও বাকিতে। শাড়ির দোকানের মালিক দুলাভাইকে বলছি, চিন্তা করবেন না, যে কোনো সময় টাকা পেয়ে যাবেন। পরিশেষে বলবো, দুলাভাই, আই অ্যাম সরি।

মাসদাইর, নারায়ণগঞ্জ থেকে

অন্তরের ধন

লেখার ভেতর দিয়েই তাকে মনে করছি। দুঃখ ভরা মনে যে আমায় প্রথম শাড়ি উপহার দিয়েছিল, বাস্তবতার নিরিখে সে শাড়ি এবং সে মানুষটি হারিয়ে গেছে আমার জীবন থেকে। অনেক শাড়ি সংগ্রহে আছে, সেই শাড়িটি নেই। অনেক মানুষ আমাকে ঘিরে আছে, সেই মানুষটি নেই।

আমার চাতক মন তাকে খুঁজে ফিরেছে মক্কার লাখো হাজিদের ভিড়ে, কারবালার মহামিলনস্থলে, রিয়াদ বিমানবন্দরের ঢাকা-কুমিল্লা, বিভিন্ন স্টেশন যেখান দিয়ে যাতায়াত হতো। কিন্তু পৃথিবী গোল হলেও ওই লোকটিকে হাজার মানুষের ভিড়েও একবার শুধু এক পলকের জন্য দেখিনি। শুধু এখন দেখার বাসনা, কথা বলা বা সান্নিধ্যে যাবার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি না। আজ আমাদের অবস্থান সম্পূর্ণ উল্টো।

আমার বিবাহিত জীবনের বাইশটি বছর পার হয়ে গেল। কতো জল গড়ালো গঙ্গায়। সুখ-দুঃখ, সংসার সমুদ্র সবই প্রবহমান। কেন জানি না আমার কিশোর প্রেমের, প্রথম প্রেমের মানুষটিকে একদণ্ডের জন্যও ভুলে থাকতে পারি না।

আমার বয়স এখন চল্লিশ। অনেক দিন হয়ে গেলেও সেই দিনগুলো নিয়েই ভাবতে ভালো লাগে। কাজ করি, ঘর সামলাই, অবসরে যাই। কিন্তু সেই মুখ, সেই ঘর, সেই রাস্তা, সেই পরিবেশ, সেই লতা-পাতাময় ঘেরা বিমানবন্দরের কোয়ার্টারের স্মৃতি নানান রূপে ও রঙে আজো আমার অন্তরকে ব্যস্ত করে রাখে। আমার শৈশব, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের দিনগুলো কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারি না।

আমরা কলোনিতে থাকতাম। আমাদের বাসার ব্যবধান ছিল তিনশ গজ। এ দোতলা থেকে ওই দোতলা মাঝ খানে বাগান ও হাটপথ। রাত গভীর হয়ে যেতো। বুঝতাম ওই জানালায় সে দাড়িয়ে। এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতো। হিম শীতেও চলতো দুই জানালায় দুজনের নীরব চেয়ে থাকার ভালোবাসা। প্রতিদিন তাকে একবার দেখা চাই। একখানা চিঠির নেয়া-দেয়া না হলে মনই ভরতো না। এভাবে কতো চিঠি লেখালেখি, কতো দেখাদেখিই না আমরা করেছি। মাঝে মধ্যে লুকিয়ে সিনেমা দেখতে যেতাম। সঙ্গে থাকতো ছোট বোন। এ জন্য বাবার হাতে দুই বোন অনেক মার খেতাম। তার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম বলে আশ্বা প্রায়ই মারতেন। আমার আশ্বা আর তার আশ্বা ছিলেন কলিগ। দুজনের জেদের কারণে শেষ পর্যন্ত আমাদের বিয়ে হয়নি। কতো যে মার খেয়েছি, কতো যে তালাবদ্ধ হয়ে থেকেছি। কোনো বাধাই আমাকে ধরে রাখতে পারতো না।

তাকে না দেখলে আমি থাকতে পারতাম না। পাড়াময় পাগলের মতো ঘুরতাম শুধুই তাকে এক নজর দেখার জন্য। তার অবস্থাও ওই রকম। অনেক মধুময় স্মৃতি। অনেক সুন্দর সময় কাটতো তার সঙ্গে। তার কোনোদিকই আমার কাছে খরাপ লাগতো না। সেও আমার আচার-আচরণ অন্ধের মতো পছন্দ করতো। জানি না তার সঙ্গে বিয়ে হলে আমাদের এ মোহ অটুট থাকতো, নাকি বাস্তবের যাতাকলে পিষে যেতো।

ভালোবাসার দিনগুলো যতো সুন্দর, যতো তীব্রতার, সংসার জীবনের দৈনন্দিন চাওয়া পাওয়া, কর্তব্য, দায়-দায়িত্ব তা মলিন করে দেয়। তারও বিয়ে হয়ে গেছে। সংসার সন্তান নিয়ে আমরা ব্যস্ত। আমরা বিবাহিত জীবনে কেউ কারো সঙ্গে দেখা করিনি। ইচ্ছা যে হয় না তা নয়। কিন্তু স্বামীর অবমাননা করা হবে। তাকেও খাটো করতে চাইনি। সে জন্য একই শহরে থেকেও কোনোদিন ফোনও করিনি। ভেতরে ভেতরে না পাবার বেদনা উপলব্ধি করি। কোনো কারণে দুঃখ পেলে তার কথা মনে হয়। কেন মনে হয় জানি না।

মনে পড়ে সেসব দিনের কথা, আমাদের ফেলে আসা ছয় বছরের সম্পর্কের কথা। এক সময় তাকে জীবিকার জন্য সউদি পাড়ি দিতে হয়। আমিও স্বামীর সঙ্গে সেখানে ছিলাম।

ওই পর্যন্তই। কোনোদিন আসা যাওয়ার পথেও তাকে দেখিনি।

বিয়ের আগে সে বিদেশ থেকে নীল খামে প্রতি সপ্তাহে চিঠি লিখতো, আমিও লিখতাম। আমার জন্য ওখান থেকে নানান উপহার পাঠাতো। সে সময় পাঠানো সেই শাড়িটি আজ আমার সংগ্রহে নেই। তার দেয়া চিঠি, ছবি, উপহার সব কিছুই সলিল সমাধি হয়েছে। কিন্তু আমার অন্তর থেকে মুছে যায়নি সে নাম। যা উচ্চারণ করতে মুখে বাধে। যার উপহারগুলো রাখতে ভয় হয়। তার স্মৃতি অন্তরময়। যাকে সামনাসামনি দেখতে, কথা বলতে এখনো লোকলজ্জা, সে আমার অন্তরময়। মৃত্যুর পূর্বক্ষণও তাকে বয়ে বেড়াবো অন্তরে অন্তরে।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

লজ্জা ভঙ্গ

পাচতলা বিল্ডিং। চারতলায় আমরা থাকি। মা-বাবা ও আমরা দুই ভাই। মোট চারজনের সংসার। আমাদের ছোট সংসার বলে সব রুমে আমাদের প্রয়োজন পড়েনি। তাই এক রুম ভাড়া দিয়েছি। সে রুমে থাকেন সীমা আন্টি। সীমা আন্টি কলেজে পড়েন এবং খাওয়া-দাওয়া আমাদের সঙ্গে করেন। তার ছোটখাটো কাজগুলো আমাকে দিয়েই করান।

একদিন ছাদে শাড়ি শুকাতে দিয়েছে। কিন্তু দুষ্ট বাতাস আমার লক্ষ্মী আন্টির শাড়িটি উড়িয়ে নিয়ে আম গাছের মগডালে ফেলে রেখেছে। আমার ডাক পড়লো শাড়িটি নামিয়ে আনার জন্য। আমার পরনের লুঙ্গি মালকোছা ছাড়াই গাছে উঠে এ ডাল থেকে অন্য ডালে গিয়ে বীরদর্পে শাড়িটি নামিয়ে আনছি। নিচ থেকে আমার দিকে তাকিয়ে আন্টি হাসতে হাসতে পেটের চামড়ায় খিল ধরিয়ে ফেলছে। তার হাসি আর থামায় কে? আমি তার হাসির কারণ সম্পর্কে কিছুই বুঝতে পারলাম না।

নিচে নেমে আন্টিকে বললাম, তুমি আমার দিক তাকিয়ে হাসছিলে কেন? আন্টি কোনোমতেই বলবেন না। আমিও নাছোড়বান্দা, না শুনে ছাড়বো না। শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না পেয়ে বললেন, তুমি যখন এ ডাল থেকে ও ডালে যাচ্ছিলে তখন নিচ থেকে তোমার নুনু দেখা যাচ্ছিল। আরেটু রস করে বললো, তোমার সঙ্গে তোমার নুনুও লাফাচ্ছিল।

আমি তো লজ্জায় খুন। আন্টির কাছ থেকে ভো দৌড়। তারপর থেকে আন্টির কাছ ঘেঁষি না। তাকে দেখলেই একটু এড়িয়ে এড়িয়ে চলি। তাকে দেখলে মাথা নিচু করে বসে থাকি। আন্টি তো পড়লো মুশকিলে। কারণ তার ছোটখাটো কাজগুলো করানোর জন্য আমাকে আর কাছে পায় না। একদিন সন্ধ্যায় আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেলেন তার রুমে এবং বললেন, এখন থেকে তোর পড়াশোনা আমার কাছেই হবে।

তখন আমি ফাইতে পড়ি। টেবিলে বসে সুবোধ বালকের মতো পড়া মুখস্ত করছি। এমন সময় আন্টি আমাকে তার কোলে বসিয়ে এগালে ওগালে চুমুতে চুমুতে বলেন তোর নুনু দেখেছি বলে তুই আমাকে

লজ্জা পাস। বোকা কোথাকার। এতে আবার লজ্জা কিসের। এই বলে আন্টি আমার হাতটা নিয়ে তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে রাখলেন। তারপর লাইট বন্ধ করে তার শরীরের কাপড়-চোপড় খুলে ফেললেন। ধবধবে শাদা শরীর অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছে।

এই গরমে ঘুমানোর সময় কাপড়-চোপড় পরনে রাখতে নেই। এই বলে আমার শার্ট-প্যান্টও খুলে ফেললেন। তারপর আমাকে তার বুকে নিয়ে অনেক আদর করলেন। আদরের এক পর্যায়ে ভেবেছিলাম আন্টি বুঝি আজ আমাকে মেরে ফেলবেন। তাই ভয়ে কেদেছিলাম। তারপর আন্টি আমাকে সত্যিকারের ভালোবাসা দিয়ে কখন যে ঘুম পাড়িয়েছেন তা টের পাইনি।

এরপর আন্টি যতোদিন আমাদের বাসায় ছিলেন ততোদিন আন্টির বুকে ঘুমিয়েছি। বিনিময়ে আন্টি আমাকে এটা-ওটা কিনে দিয়েছেন ও পড়িয়েছেন। তার কাছে কাছে রেখেছেন। ফলে আমার মা-বাবা আন্টিকে সোনার টুকরা বলে আখ্যায়িত করেছেন। আখ্যায়িত করেছেন অনেক গুণবাচক বিশেষণে। কিন্তু কেন যে সীমা আন্টি আমাকে এতো আদর করতেন বা এই আদরের মূলে রয়েছে কি তা আমার মা-বাবা বুঝতে পারেননি। আজ আমি সীমা আন্টি থেকে অনেক দূরে। জানি না সীমা আন্টি কোথায় আছেন। সেদিন সীমা আন্টি আমার ওপর জোর করতেন। কিন্তু আজ যে সীমা আন্টির সেই দসি আদর পেতে খুবই ইচ্ছা করে।

আজ যে আমার লজ্জা নেই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক,
শুক্রবাদ, ঢাকা থেকে

দ্বিখণ্ডিত ধরণী

তিনি যে আমার বাবা নন এটা আমি কখনোই উপলব্ধি করিনি। আমার যখন সাত মাস বয়স তখন রোড অ্যাকসিডেন্টে জন্মদাতা বাবা মারা যান। মা ছিলেন অপরূপা সুন্দরী। সেই সুন্দরের ছায়া আমার দেহেও এখন উকি-বুকি মারছে। মামাদের চাপে এবং সমাজের ফিশফাশ থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য অপরূপা সুন্দরী মা আবার বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। আমার মা, মামা, নানিকে অবাক করে দিয়ে নতুন বাবা আমাকে বুকে টেনে নিলেন।

আমার পাচ বছর বয়সের সময় আমি একটা ভাই উপহার পাই। পাচ বছর বয়স পর্যন্ত বাবা আমাকে এমনই স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতেন যে, মাও মাঝে মধ্যে বিরক্ত বোধ করতেন বলে শুনেছি। ভাইটি জন্মের পর সবাই ভাবলো বাপ-মেয়ের আদিখ্যেতা টাইপের স্নেহের বুঝি পরিসমাপ্তি ঘটলো। কিন্তু কিছুই ঘটলো না। চোদ্দ বছরের কিশোর জীবনে আমি কখনো স্নেহের ভাগাভাগি দেখিনি। বরং ভাইটির চেয়ে আমার প্রতি স্নেহের পক্ষপাতিত্বে অবাক হয়ে যেতাম। জন্মদাতা বাবা না হয়েও তিনি হয়ে ওঠেন আমার চোখে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বাবা।

চোদ্দ বছর পেরিয়ে আজ আমি পনেরোতে পা দিচ্ছি। আজ আমার জন্মদিন। ভাইটিকে সঙ্গে নিয়ে মা মামাবাড়ি গেছেন ওয়ারিশ সংক্রান্ত জমিজমার নিষ্পত্তি ঘটাতে। বেখেয়ালি বাবার দেখাশোনার জন্য বাবার অনুমতি সত্ত্বেও মামাবাড়ি যাওয়া বাতিল করলাম।

জন্মদিনের সকালে ঘুম থেকে উঠে মনটাই খারাপ হয়ে গেল। মা নেই, ভাইটিও নেই। তবুও অফিসে যাওয়ার সময় বাবার পা ছুয়ে সালাম করলাম।

সালাম কি জন্য মামণি?

আজ আমার জন্মদিন বাবা।

হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ মাই ডিয়ার। বড় হও, দীর্ঘজীবী হও। শুধু বেড়ে উঠো, শুধু বেড়ে।

বিকেলে অফিস থেকে ফিরে বাবা আমার হাতে একটি প্যাকেট তুলে দিলেন। খুলে দেখি একই রকম আশ্চর্য সুন্দর দুটি শাড়ি।

একটি তোমার জন্য, একটি তোমার মামণির জন্য। এক ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করা হলো। শাড়ি পরে সাজগোজ করে এসো রিকশায় ঘুরতে বের হবো। তারপর রাতে চায়নিজ রেস্টুরেন্টে খেয়ে বাসায় ফিরবো।

শাড়ি পরে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে সেজে যখন আয়নার সামনে দাড়ালাম তখন বুঝলাম আমি দিন দিন কি অবিশ্বাস্য রকমের সুন্দরীই না হয়ে উঠছি।

আমার জীবনের প্রথম শাড়ি উপহার এবং প্রথম শাড়ি পরা আজ। কি আনন্দ! আমার চোখ টলমলে। বাবা এতো ভালো কেন?

ফিরলাম রাত পৌনে এগারোটায়। সোজা বিছানায়। নষ্ট হোক শাড়ি। তবুও আজ শাড়ি পরেই ঘুমাবো। বিছানার ওপর মামণির শাড়িটি পড়ে রয়েছে। আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। মামণি থাকলে কতোই না মজা হতো। বিছানায় শুয়ে মামণির শাড়িটি বুকে জড়িয়ে ধরলাম।

কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ জেগে উঠলাম। আমার নাক দিয়ে নতুন শাড়ির গন্ধ পাচ্ছি। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারছি না কেন? চোখ খোলা, অথচ কিছু দেখছি না কেন? মামণির শাড়িটি মুখ থেকে সরাতে পারছি না কেন? একটি চিৎকারও করতে পারছি না কেন?

তীব্র ভূমিকম্পে পৃথিবী লগ্নভগ্ন হওয়ার পর মামণির শাড়িটি মুখের ওপর থেকে আলগা হলো। প্রিয়জন দেখতে এলে মৃত মানুষের কাফনের কাপড় যেভাবে কষ্টে বুক ফেটে যাওয়া দুঃখের মতো মুখ থেকে ধীরে ধীরে সরানো হয় সেভাবে মামণির শাড়িটি মুখ থেকে সরলাম।

দেখলাম বাবা রুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

বাবা না পিশাচ?

হায় ইশ্বর, ধরণীকে দ্বিখণ্ডিত করো।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

নতুন ও পুরনো

– ডেইজী

ফ্রক ছেড়ে সালায়ার কামিজ ধরতে না ধরতেই শাড়ি পরতে হলো অর্থাৎ তেরো বছর বয়সেই বিয়ে হয়ে গেল। অল্প বয়সে বিয়ে হলে যা হয়। খুব একটা সুখের বা আনন্দময় হয়নি বিবাহিত জীবন। এতো অল্প বয়সে দশ বা এগারো হাত শাড়ি পরতে জানতাম না। তবুও শ্বশুরবাড়ির নানানজনের কথার ঠেলায় এক সময় শাড়িও পরতে শিখে গেলাম। নানান ঘাত-প্রতিঘাতে মধ্যেও এক ছেলে এবং এক মেয়ের মা হয়ে গেলাম।

আমার স্বামী একটা বেসরকারি অফিসে চাকরি করতেন। হঠাৎ করেই তিনি একদিন চাকরিচ্যুত হয়ে গেলেন। তিনি চাকরির আশায় হন্যে হয়ে খোজাখুজি শুরু করলেন। আমাদের অভাব অনটন শুরু হলো।

সংসারে আমরা দুইজন আমাদের পাচ বছরের ছেলে এবং তিন বছরের মেয়ে। ঢাকা শহরে চারজনের সংসার বাসা ভাড়া দিয়ে সব কিছু মিলিয়ে হিমশিম খাওয়ার অবস্থা। এক সময় হাতের জমা টাকা শেষ হয়ে গেল। ফ্ল্যাটবাসা ছেড়ে চারদিকে বেড়া দেয়া উপরে টিন এবং কমন বাথরুমের ঘর ভাড়া নিলাম। আমার বিয়ের গহনা বন্ধক দিয়ে কিছুদিন চললো। এরপর গলার চেইন হাতের চুড়ি সব একে একে বিক্রি করতে হলো। টাকার অভাবে বাচ্চা মেয়েটাকে বার্লি জ্বাল দিয়ে খাওয়াই, দুধ খাওয়াতে পারি না।

বছর ঘুরে এলেও স্বামী চাকরি পেলো না। দেখতে দেখতে পরনের শাড়িও ছিড়ে গেল। ঘরে তোলা শাড়িও আর নেই। স্বামীর মুখ চেয়ে কিছু বলিও না। ঘরে চাল ডালই বাড়ন্ত। ছেড়া শাড়ি সেলাই করে পরি। আচল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরি, তাও ছেড়া ঠেকাতে পারি না। কমন রান্নাঘর এবং টয়লেট গোসলখানা থেকে বের হলেই অন্য সদস্যদের সামনে পড়ে যাই। তার মধ্যে পুরুষ সদস্যও থাকে। এটা বোধহয় স্বামী খেয়াল করলেন। তিনি কোথা থেকে টাকা ধার করে একটা কম দামি শাড়ি কিনে আনলেন। শাড়িটা এতোই কম দাম যে, এক সময় এ ধরনের শাড়িই আমার বুয়াকে দিয়েছি। তবুও স্বামীর মন রক্ষার জন্য শাড়িটা বাসায় পরলাম। কয়েকদিন পরই আমার আপন বড় বোন আমার বেড়ার ঘরে বেড়াতে এলেন। বোনের স্বামী আবার সেই সময় আদম ব্যবসা করে বেশ ভালো অবস্থায় আছেন। আমার স্বামী তাকে খুব একটা পছন্দ না করলেও আমার বোন বাসায় এলে আমাকে কিছু বলতেন না।

আমার বোন আমার শাড়ি দেখে আমাকে তিরস্কার করলেন এতো কম দামি শাড়ি পরে আছি বলে। আমি অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে তাকে বললাম, আমার এই কম দামি শাড়িটা বদলে একটা ভালো সুতির শাড়ি দিতে। তিনি দয়াবশত আমার সেই কম দামি সুতির শাড়ি নিয়ে তার একটা ইনডিয়ান সুতির শাড়ি দিলেন আমাকে পরতে। আমি মনের সুখে শাড়িটা পরলাম।

কিন্তু একি! সাত দিন না যেতেই শাড়িটা ফেসে ফেসে যেতে লাগলো। আচলের দিকটা, কোমরের দিকে দিই, তাও ছিড়ে যায়। কুচি দিয়ে না পরে এক প্যাচে পরি, তাও দেখি নরম শাড়ি, আর ভালো থাকে না, ফ্যাস ফ্যাস করে ছিড়ে যায়।

আমার স্বামী ব্যপারটা চুপচাপ খেয়াল করলেন। তারপর আমাকে বললেন, আমি যে শাড়িটা দিয়েছিলাম সেটা কম দামি অবশ্যই। কিন্তু নতুন ছিল অন্তত দুই তিন মাস পরতে পারতে। এখন যে ওটা দিয়ে পুরনো শাড়ি নিয়ে এলে সেই তো আগের অবস্থানেই ফিরে গেলে।

আমি লজ্জায় তার কাছে ক্ষমা চাইলাম। আমার বোন আমার সেই কম দামি শাড়িটা ততোদিনে তার কাজের বুয়াকে দিয়ে দিয়েছি। এবং সে আমার এই অভাব অনটনের মধ্যেও আর শাড়ি দিয়ে সাহায্য করেনি।

অনেক দিন পর স্বামী চাকরি পেয়েছেন। ধার-দেনা যা কিছু ছিল ধীরে ধীরে সব শোধ করেছি।

আজ একুশ বছর পার হয়ে গেছে। বর্তমানে আমার ছেলেমেয়ে দুজনেই ডাক্তারি পাস করেছে। আমার প্রতি জন্মদিনে এখন দুই তিন হাজার টাকার শাড়িও গিফট দেয়। ওদের খুশি করার জন্য সেই শাড়ি পরে ওদেরকে নিয়ে চায়নিজ খেতে যাই। হাসি-ঠাট্টা করি, গল্প-গুজব করি। কিন্তু সেই কষ্টের কথা যখন মনে পরে যায় ভুলতে পারি না। মাঝে মধ্যে মনে হয়, আমার বোন কি আমার কম দামি শাড়িটা না নিয়েও তার পুরনো দুই তিনটা শাড়ি আমাকে পরতে দিতে পারতো না?

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে

অনভ্যাস

- পারভীন

একেকটা দিন একেক রকমভাবে শুরু হয়। সকাল থেকেই আজ আকাশের মুখ ভার, মাঝে মধ্যেই কেপে বৃষ্টি আসছে আবার থেমেও যাচ্ছে। দোতলার বারান্দার গুল ধরে ঠায় দাড়িয়ে আছি। দূরে কোথাও গান বাজছে - আকাশ মেঘে ঢাকা, শাওন ধারা ঝরে...।

আমার মনটাও আজ আকাশের মতোই থমথমে ব্যথিত। বাসায় কেউ নেই। বাচ্চারা স্কুলে, হাজব্যাড অফিসে। আজ আমাদের বিয়ের চোদ্দ বছর পূর্ণ হলো। দেখতে দেখতে এতোটা দিন পার হয়ে গেল। আশ্চর্য! অথচ সে একবারও কিছু বললো না।

বিয়ের প্রথম কয়েক বছর খুব আনন্দে কেটেছে আমাদের। তখন ও ফুল, ছোট কোনো অলংকার কিনে দিতো অথবা কোথাও বেড়াতে অবশ্যই নিয়ে যেতো আর আমি চাইতাম সে আমাকে যদি একটা শাড়ি কিনে দিতো! কেন জানি খুব এ ইচ্ছা হতো। অথচ ভাবতে অবাক লাগে, বিয়ের আগে শাড়ি পরাটা একদম পছন্দ করতাম না। আমার কতো শাড়ি ছিল, কোনোদিন পরিনি। বান্ধবীরা শাড়ি পরলে বকতাম তাদেরকে। বলতাম, এই, তাদের বয়স্ক সাজার খুব শখ, না?

একবার কলেজে সবাই ঠিক করলো সিনেমা দেখতে যাবে। আমি রাজি হচ্ছিলাম না। শেষে সবাই অনেক বুঝিয়ে অনুরোধ করলো আমরা যাবো শাড়ি পরে। না হলে আমাদের বয়স্ক দেখাবে না আবার সিনেমা হলেও ঢুকতে দেবে না। শেষে কি করা! রাজি হলাম। কোনো মতে শাড়ি পরেছি, খুড়িয়ে হাটছি। আসার সময় লোকজন দেখি আমার দিকে হা করে তাকিয়ে আছে। কয়েকজন তো হো হো করে হেসে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কি বিদেশি? শাড়ি পরতে জানেন না?

এদিকে কখন যে আমার শাড়ি খুলতে খুলতে আচল হয়ে গেছে টেরই পাইনি। আমার বান্ধবীরাও বলেনি। রাগ করে তাদের সঙ্গে সাত দিন কথাই বলিনি।

বিয়ের সময় এক মজার কাণ্ড হয়েছিল। আমার শাশুড়ি, ননদকে জানিয়েছিলাম শাড়ি পরে আমি ইজি হতে পারি না। আমার হাজব্যান্ডও শুনে বলেছিল, ঠিক আছে, তোমাকে শাড়ি পরতে হবে না। কিন্তু বাঙালি কথা দিয়ে কথা রাখে না সে জন্য বিয়ের পর থেকেই তাদের দেয়া কথা তারা ভুলে গিয়েছিল। শাড়ি পরতে হবে, শাশুড়ি বললেন।

শ্বশুর পছন্দ করে না, আত্মীয়স্বজন কি বলবে এসব ভেবে দিনের পর দিন মুখ বুজে সব সহ্য করেছি। কষ্ট হতো। কারণ শাড়ি পরার অভ্যাস ছিল না। শাশুড়িকে জানিয়েছিলাম যে, আমার ননদরা কেউ শাড়ি পরে না, আমি শাড়ি না পরলে অসুবিধা কোথায়। শাশুড়ি আদেশ দিলেন তারা তো মেয়ে কিন্তু তুমি বৌ। তাই বাড়িতে বৌয়ের মতোই থাকবে। আমার হাজব্যান্ডও একই কথা বললেন।

একদিন নিউ মার্কেটে গিয়ে একটা নীল সিল্ক খুব পছন্দ হয়েছিল। হাজব্যান্ডকে বলতেই সে ধমকে উঠেছিল, তুমি তো শাড়িই পরো না, তো কিনে করবে কি? আমার পয়সা এতো শস্তা না।

পরে অন্য একটা কিনে এনেছিল। তবে আমার সেই ভালোলাগাটা আর ফিরে আসেনি। আরেকদিন একটা বড় প্যাকেট এনে আলমারিতে রেখেছিল। খুলেই দেখি খুব সুন্দর একটা কাতান শাড়ি। আমি মনে করেছিলাম হয়তো বা আমারই। খুশিতে ডগমগ হয়ে শাড়িটা গায়ের ওপর ধরতেই সে কেড়ে নিল। ধমকে বললো, এটা তোমার না।

পরে শুনলাম আমার ননদের জন্য। আমাকে ভালোভাবে বললেই পারতো। শাড়িটা না পাওয়ার চেয়ে তার দুর্ব্যবহারে কষ্ট পেয়েছিলাম খুব। স্ফোভে, দুঃখে চোখে পানি এসে গিয়েছিল। শাড়ি পরতে না চেয়ে কি যে ভুল করেছিলাম তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম। আমার এক বিদেশি বান্ধবী লিভাকে সব বলেছিলাম। সে সান্ত্বনা দিয়েছিল। এটা কোনো ব্যাপার নয়, তুমি দুঃখ করো না। তবে আমি বুঝতে পারছি না বাঙালি মেয়েরা ঠিক কি চায়। লাভ ইজ ওনলি ফর শাড়ি, নাকি শাড়ি ইজ ওনলি ফর লাভ! তোমাদের কাছে কোনটা বড়?

লিভা আমাকে মনে রেখেছে। আমার গত জন্মদিনে সে খুব সুন্দর গর্জিয়াস একটা শাড়ি পাঠিয়েছিল। কেন জানি বার বার তার কথা মনে করিয়ে দেয় বাঙালি, বাংলাদেশি নারী মুখে যতোই বলুক, শাড়ি পরি না কিন্তু মনে মনে সকলেই শাড়ির জন্য লালায়িত। এ যে বাঙালি নারীর ভালোবাসার চিরন্তন পোশাক। এই বৃষ্টিস্নাত দুপুরে নিজের কাছেই যেন নিজের প্রশ্ন ফিরে আসে, আমিও কি ওই একই দলে?

কলিৎবেলের শব্দে সখবিৎ ফিরে পেলাম। কে এলো এই অসময়ে? বুয়াকে দরজা খুলতে বললাম। আমি দাড়িয়েই আছি বারান্দার গুল ধরে। আবার মেঘ করেছে। আজ আর বৃষ্টি কমবে না। বাচ্চারা

ফিরবে অল্প কিছুক্ষণ পরেই। খেতেও ইচ্ছা করছে না কিছু। হঠাৎ পরিচিত শব্দে ফিরে তাকালাম। আমার হাজব্যাণ্ড! এ সময় তো তার আসার কথা না! অবাক হলেও মুখে কিছু বললাম না। আমার মুখ দেখেই টের পেয়েছে হয়তো আমার মন খারাপ। সে কিছু না বলে ভেতরে চলে গেল। আমি আবার গুলে মুখ লুকালাম। ভাবলাম এটাই তো স্বাভাবিক। পরক্ষণেই কাধে হাতের স্পর্শ পেয়ে ফিরে তাকালাম। সে হাসছে। আজ অফিসে যাবো না, ভালো লাগছিল না। তাই চলে এলাম। বিকেলে তোমাকে নিয়ে বের হবো। তুমি চাইলে রাতে বাইরে খাবো, তোমার যে কোনো পছন্দের শাড়ি কিনে দেবো। কি, খুশি তো?

দুই চোখ ভরা আনন্দ এবং অবিশ্বাসে আমরা মুখোমুখি হলাম।

থানাপাড়া, কুষ্টিয়া থেকে

পক্ষপাতিত্ব

– গুলনাহার ইসলাম মনু

তখন আমি বেশ ছোট, স্কুলে পড়ি। খুব সম্ভবত ক্লাস নাইনে। থাকতাম ঢাকার গুলশানে। তখনকার গুলশান ছিল খুব নিরিবিলা। এখনকার মতো এতো হাইরাইজ বিল্ডিং ছিল না। তখন একতলা দোতলা ঘরই ছিল বেশ ফাকা অনেক জায়গা নিয়ে।

যাই হোক। আমি ছিলাম বোনদের মাঝে ছোট তাই আমার কোনো শাড়িও ছিল না। মাঝে মধ্যে শখ করে ওদের শাড়ি পরতাম। আমাদের সমস্ত সংসারটা আম্মাই চালাতেন বেশ সুচারুভাবে। আন্মা টাকা দিয়েই খালাস। কাপড় চোপড় কখনো তিনি কিনতেন না। আমাদের যা প্রয়োজন হতো আম্মা নিউ মার্কেট নিয়ে গিয়ে কিনে আনতেন। আন্মাকে দেখালে ভালোই বলে পেপারে মনোনিবেশ করতেন। মাঝে মধ্যে খুব রাগ হতো। আন্মা খবর আর পেপার ছাড়া কিছুই বোঝেন না, অথচ আমার বান্ধবীর বাবা তাদের জন্য কতো সুন্দর কাপড় কিনে আনেন।

আন্মা কিন্তু আমাদের সঙ্গে ঠিকই ক্যারাম খেলতেন, গল্প-গুজব করতেন। তেমন একটা রাশভারী টাইপের ছিলেন না। তাই আন্মাকেই সরাসরি অভিযোগ করতাম কখনো আমাদের জন্য কিছু আনেন না বলে। আন্মা হাসতেন। বলতেন, দূর ওসব তোর মা-ই ভালো চেনে, আমার দ্বারা ওসব হবে না। যাই হোক। এভাবেই কাটছিল দিনগুলো। আন্মা ছিলেন প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা। তাই গাড়ি পেতেন। একদিন গাড়ি থেকে নামলেন হাতে একটা প্যাকেট নিয়ে।

তারপর নেমেই আমাকে ডাকলেন মনু দেখ, তোর জন্য কি এনেছি!

আমরা সকলেই হতবাক।

তাড়াতাড়ি প্যাকেট খুলতেই খুব সুন্দর নীল একটা লেসের শাড়ি বেরিয়ে পড়লো। এ শাড়িটা আমার ভাবতেই অবাক লাগলো। বিশেষ করে যে আন্মা ঘরের কোনো জিনিসই কেনেন না, চেনেন না বলে। আম্মা হেসে বললেন, সূর্য আজ কোন দিকে উঠলো যে মেয়ের জন্য শাড়ি আনলে? তাও আবার বড় দুটো বাদ দিয়ে ছোটটার জন্য!

আম্বা হাসলেন। আরে, আসার পথে এ শাড়িটা দোকানে ঝোলানো ছিল। হঠাৎ মনে হলো এ শাড়িটা আমার মনুকে খুব মানাবে। তাই কিনে আনলাম।

আসলে আমি ছোট বলে আমার প্রতি আম্বার পক্ষপাতিত্ব ছিল একটু। আমার বড় দুই বোন মুখ কালো করলেও স্বীকার করলেন যে, আম্বার চয়েস আছে।

এরপর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। আমার আম্বাও আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। কতো দামি শাড়িই কিনেছি। স্বামীও কিনে দিয়েছে। কিন্তু এখনো আম্বার ওই শাড়িটার মতো আর কোনো শাড়িই আমার এতো প্রিয় নয়। এতো আনন্দও অন্য কোনো শাড়ি পেয়ে হয়নি আমার!

এখন আমার মেয়েও শাড়ি পরে মাঝে মধ্যে। অন্য শাড়িগুলো পরতে দিলেও এ শাড়িটা আমি কখনো পরতে দিইনি। মনে হয় এটা যে শুধু আমারই জন্য কেনা। এটার মাঝে যে আম্বার হাতের ছোয়া রয়েছে।

পূর্ব নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম থেকে

কালো

– মোল্লা আবদুর রহিম

আমার মায়ের আপত্তি, কালো নামের ছাগলের বাচ্চাটি আর বাসগৃহে থাকতে পারবে না। ওর অত্যাচারে মা অতিষ্ঠ। প্রায় একযুগ ধরে কালার পূর্ব পুরুষদের মা নিজ হাতে লালপালন করে এদের উপার্জনে সংসার খরচ যুগিয়েছেন। মায়ের সকল সন্তানই এখন সুপ্রতিষ্ঠিত।

বাচ্চাটির দুই মাস বয়সে ওর মা মারা গেলে, স্মৃতি জড়িত ছাগল ঘরটিতে তালা লাগিয়ে আমার মা ওকে আমাদের বাসগৃহে নিয়ে আসেন। এবং লালন-পালন করতে থাকেন। আমার ছয় বছরের মেয়ে মৌরিন, আমার স্ত্রী, মা এবং আমার সঙ্গে দিন দিন ওর সম্পর্ক গভীর হয়ে ওঠে। কালো রঙের বলে মৌরিন তাকে কালো বলে ডাক দিলেই অমনি হাজির।

শিং দিয়ে গুতো, জিভ চাটা, তিড়িং বিড়িং লাফ এভাবেই কাটে সারাবেলা মৌরিনের সঙ্গে। বারান্দার এক মাথা থেকে অন্য মাথায় পাল্লা দিয়ে দৌড়। পরস্পরে রান্না ঘরে খেতে গেল। কালো দিনে দিনে অনেক বড় হয়ে উঠেছে। তৃণভোজী কালো দুধ-ভাতে এখন আমাদের পরিবারের সদস্য।

বাড়ির কুকুরটাকে ফ্যান খাওয়ার সময় শিংয়ের গুতোয় ফুটো করাতে মা ভীষণ রেগে গেলেন। ভয়ে কুকুরটি আর বাড়িতে ঢোকে না। মৌরিনকে অনেকবার পা চাপা দিয়েছে। ঘরের পিড়ি, বেড়া, শিংয়ের গুতোয় ঝাঝরা করেছে। উঠানে, ঘর, হাড়ি-পাতিল এলোমেলো করেছে। এসব কারণে মায়ের আপত্তি।

কয়েকদিন ধরে মায়ের মেজাজটা ভারী খারাপ। তার জায়নামাজে হেগেছে, ওজুর পানিতে পা দিয়েছে, কোমরে দিয়েছে গুতো। এর উপর আর এক কাণ্ড। মা ঘরের বেড়ার সঙ্গে নামাজের শাড়ি শুকাতে দিয়েছিলেন। কালো আর মৌরিন সেটি নামিয়ে ধূলায় মেখে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললো।

কালার শিংয়ের সঙ্গেও শাড়ির টুকরো লেগে ছিল। মা দেখা মাত্র চিৎকার করে বাশের লাঠি দিয়ে পেটাতে শুরু করলে মৌরিন দৌড়ে ঘরে আর কালা কয়েক লাফে বাগানে হারিয়ে গেল। মা রাগে কাপতে লাগলেন।

বললেন, আজ ওর একদিন নইলে আমার একদিন।

আমি বললাম, মা, ও তো অবলা জীব, অতো কি আর সে বোঝে!

শাড়ি ছিড়ে ফেলাতে মা মনে কষ্ট পেয়েছে।

মা, এই সামান্য ব্যাপারে তুমি যদি আর চিন্তাচিন্তি করো তবে তোমার অন্য সন্তানদের মতো আমিও থামের বাড়ি ছাড়বো বলাতে আরো গম্ভীর হলেন। রাতের বেলা ঘরে এসে ঠাই না পেয়ে বাগানে রাত কাটালো। সকালে সিদ্ধান্ত নিলাম কালাকে বিক্রি করে দেবো।

সকালে অনেক কষ্টে তাকে ধরে গলায় দড়ি লাগিয়ে টানতে শুরু করলাম। বারকয়েক ছুটে গিয়ে মা ও মৌরিনের গা ঘেষে দাড়ানোর চেষ্টা করলেও আমি নাছোড়বান্দা। টেনে-হেঁচড়ে বাড়ির কাছে বাজারে কসাইয়ের কাছে বিক্রি করে দিলাম। অবশ্য দড়িটা কসাইয়ের হাতে দেয়ার সময় দেখি কালার দুচোখ থেকে শুধু পানি ঝরছে। আগের মতো আর মাতামাতি না করে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছিল। জানি না ও আমাকে কি ভাবলো, তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে সরে পড়লাম।

মায়ের জন্য একটা ভালো শাড়ি আর কিছু বাজার করে বেলা করে বাড়ি ফিরেছি।

মেয়েটি আমাদের পথের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে বললো, কালাকে নিয়ে এলে না কেন? আমি এখন খেলবো কার সঙ্গে বাবা!

মাকে শাড়িটা দিতেই বললেন, তোর কাছে শাড়ি চাইছি নাকি যে ছাগলটারে বেচছিস।

শাড়ি ছেড়াতে মা যে কষ্ট পেয়েছিলেন কালাকে বিক্রি করে দিয়েছি বলাতে মাতৃহৃদয় তার চেয়েও বেশি আঘাত পেয়ে নতুন শাড়িখানা ছুড়ে ফেলে দিল উঠানে। মৌরিনের কান্না থামাতে পারছি না।

সন্ধ্যার দিকে কসাই আক্কেল মিয়া বাড়িতে ঢুকে শুরু করলো চিন্তাফাল্লা।

মা বললেন, কি ব্যাপার মিয়া।

আক্কেল বললো, এমন বদের হাড়ি খাসি আমার তিন চারটিকে গুতিয়ে রক্তাক্ত করে পালিয়েছে।

মা খুব খুশি। আমি কিছু বলার আগে মা আক্কেলের খাসির দাম ফেরত দিয়ে দিলেন। আক্কেল চলে গেলে মা খুজতে যাবে কালাকে এমন সময় বারান্দায় সেই চিরাচরিত যুগল দৌড় মৌরিন আর কালা।

মা এবং আমি বারান্দায় আসতেই ঘাড় আর শিং দিয়ে আমাদের মৃদু আলিঙ্গন করলো।

পরদিন থেকে মা সেই নতুন শাড়ি পরে নামাজ পড়তে লাগলেন।

খুলনা থেকে

আশা

– আলমগীর

বাসর রাতে বৌ বলেছিল, শাড়ি পরবে না সে পরবর্তী কালে। শাড়ি পরলে বুড়ি লাগে। বিয়ে হলো আজ সাত বছর। শাড়ি পরতে খুব একটা দেখিনি। তবে মাঝে মধ্যে শাড়ি পরে। শাড়ি পরলে রাতে আমার সুবিধা হয়। ভাত খাওয়ার পর শাড়ির আচলে মুখ মুছি। বৌ বলে তাতে নাকি মায়া বাড়ে। একবার এক দোকানদার থু পিস চায় পাচ হাজার টাকা। তাই মনটা খারাপ করে বৌকে বললাম, চলো ভালো একটা শাড়ি কিনি। কিনলাম শাড়ি। বললাম, বাসায় চলো। শুনে সে আকাশ থেকে পড়লো। বললো, ব্লাউজ? ও হ্যা, ব্লাউজ তো তারপর পেটিকোট। সবশেষে সেফটিপিন। আচল খসে যেন হিমালয় না বের হয়। তাই সেফটিপিন।

মা আমার পছন্দ করেন এক কালার এবং মোটা শাড়ি। কতোদিন হয় মাকে শাড়ি দেয়া হয় না। ২০০৩ সালের আগস্ট মাসে দেশে আসবো, তোমার জন্য এবং মায়ের শাড়ি কিনে আনবো।

আনকোনা, ইটালি থেকে

ইন্দ্রানী

– শূন্য

অনেক দিন ধরেই খেয়াল করছি আমার পছন্দের সব কিছুই জয়িতার অপছন্দ। একদিন নতুন কেনা চমৎকার একটা শার্ট পরে জয়িতার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমাকে দেখেই সে তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করে উঠলো, এই, এটা কি পরেছো? তোমাকে বাসের হেলপারের মতো লাগছে।

বাসের হেলপাররা যে আলাদা বৈশিষ্ট্যের শার্ট পরে সেটা আমার জানা ছিল না।

পছন্দের এতো ব্যবধান সত্ত্বেও মেয়েটা আমাকে সহ্য করেছে কিভাবে কিংবা আমিই বা তাকে কিভাবে মেনে নিচ্ছি সেটা একটা বিস্ময়।

মেয়েদের পোশাকের মধ্যে শাড়িটা আমার পছন্দ। সব সময় না, মাঝে মধ্যে, বিশেষ কিছু দিনে। জয়িতার আবার শাড়িতেই এলার্জি। জয়িতাকে একদিন বললাম, জয়ি, নয় তারিখে আমার জন্মদিন। সেদিন কি তুমি শাড়ি পরে আসতে পারবে? ভালো হয় যদি শাড়ির রঙ আকাশি হয়।

জয়িতা আমার দিকে তাকিয়ে আশ্বাসের হাসি হাসলো।

নয় তারিখে পাঞ্জাবি চাপিয়ে হাজির হলাম। শাড়ির বিপরীতে পাঞ্জাবি মানায় ভালো। আর জয়িতা আমার কথার চূড়ান্ত অমর্যাদা ঘটিয়ে আমাকে বজ্রাহত করে জিন্স প্যান্ট আর ঢোলা একটা গেঞ্জি পরে উপস্থিত হলো। আমি অভিমানে বাকরুদ্ধ হলাম।

পহেলা বৈশাখে জয়িতা আমার কথা রাখলো। সেদিন সে শাড়ি পরে এলো। তবে শাড়ি না পরলেই ভালো হতো। সেদিন ডিসি হিলে নববর্ষ পালন করতে আসা সব মেয়েই পরেছে বাসন্তী বা শাদা

রঙের শাড়ি। আর জয়িতা বেগুনি রঙের মতো কুৎসিত শাড়ি পরে নববর্ষ পালন করতে এসেছে।
আবার জিজ্ঞাসা করলো, আমাকে কেমন লাগছে?

চমৎকার! একেবারে ইন্দ্রানীর মতো।

ইন্দ্রানী কে? তোমাদের পাশের বাসার মেয়েটা বুঝি?

জয়িতার এসব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার মধ্যে বছর শেষ হয়ে চোদ্দ ফেব্রুয়ারি এলো। আমি আতঙ্কিত হয়ে ওদের কলেজ গেটের সামনে অপেক্ষা করছি। না জানি কোন সাজে সে সেজেছে আজ। আমাকে অবাক করে দিয়ে জয়িতা আমার সামনে এসে দাড়ালো। তার গায়ে আকাশি রঙের চমৎকার একটা শাড়ি। অন্য রকম সুন্দর লাগছে তাকে।

জয়িতা আমার দিকে তাকিয়ে কপট হেসে জিজ্ঞাসা করলো, আজ কি আমাকে তোমাদের পাশের বাসার মেয়েটার চেয়েও সুন্দর লাগছে? কি যেন নাম মেয়েটার, ইন্দ্রানী, তাই না?

জবাব দিলাম, ইন্দ্রানীর চেয়েও সুন্দর লাগছে তোমাকে।

চটুগ্রাম থেকে

প্লাস্টিক

– মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হাবিব

হলুদ রঙের প্রতি বরাবরই আমার দুর্বলতা রয়েছে। এ নিয়ে বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ে নানান রকম টিপ্পনি কাটলেও কেন যেন রঙ পছন্দের বেলায় এখনো হলুদকেই প্রাধান্য দিই। অবশ্য এর পেছনে ছোট্ট একটা কাহিনীও রয়েছে। সবেমাত্র বিয়ে করেছি, মাস চারেক হবে হয়তো। প্রিয় স্ত্রীকে তেমন কিছু দেয়া হয়নি। মনে মনে খুজছিলাম পছন্দের যুৎসই পণ্য। ইতিমধ্যে এক বিয়ে বাড়িতে গিয়ে খুজে পেলাম পছন্দের সেরা জিনিসটি। সেটি আহামরি কিছু নয়, বাঙালি ললনার প্রিয় শাড়ি। বিয়ে বাড়িতে গিয়েই নজরে পড়লো হলুদ শাড়ি পরে অতিথিদের সম্ভাষণ জানাচ্ছে এক মহিলা। অপূর্ব মানিয়েছে হালকা হলুদ শাড়িতে। সেই থেকে আমিও মনস্থির করলাম স্ত্রীর জন্য আমার প্রথম উপহার হবে হলুদ শাড়ি। স্ত্রীকে সারপ্রাইজ দেবো বলে বিষয়টি তার কাছে গোপন রেখে সুযোগ পেলে হলুদ শাড়ি খুজতে লাগলাম।

এরই মধ্যে পেশাগত কারণে গেলাম সীমান্তের শহর যশোর। স্থানীয় সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় জানতে পারলাম, এ শহরেই রয়েছে ইনডিয়ান পণ্যের বিশাল বাজার। একেই বলে যেন মোক্ষম সময়। শাড়ির ব্যাপারে তেমন অভিজ্ঞতা না থাকলেও আমার মতো অনভিজ্ঞ আরো দুইজনকে নিয়ে অতি আল্লাদে ছুটে গেলাম চোরাকারবারীদের বিশাল সাম্রাজ্যে! বস্তিতে। শাড়ির কথা বলতেই জামদানি, বেনারসি, কাতান নামের হরেক রকম নামের শাড়ির স্তূপ এলো আমাদের সামনে। কোনোটাই পছন্দ হচ্ছে না দেখে তারাও এক প্রকার বিরক্ত হয়ে উঠেছে। তাদের বোঝাতে পারছিলাম না, কি রকম হলুদ শাড়ি আমার প্রয়োজন।

অবশেষে হৃদিশ মিললো হলুদ শাড়ির। বেশি দরাদরি না করে ছয়শ টাকায় কেনা হলো সাধের ধন। বের হতেই বিপত্তি। শাড়ি বগলদাবা করে যেই চোরাকারবারী পল্লি থেকে বের হতে যাবো অমনি পথ আগলে দাড়ালো পুলিশ। হয় শাড়ি, নয়তো টাকা, তবেই মুক্তি। কি আর করা! অগত্যা দুশ টাকায় শাড়ির মুক্তি মিললো। তবুও আমার উৎসাহে ভাটা নেই। হাজার হোক হলুদ শাড়ি, তাও আবার ইনডিয়ান টিসু কাতান। এ শাড়ি পেলে বৌ আমার নিশ্চয়ই খুশিতে গদগদ হয়ে যাবে। অবশেষে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে আমার সারপ্রাইজ পর্ব শুরু করলাম। হলুদ শাড়িখানা ব্যাগ থেকে বের করে এর নাম, ক্রয় কাহিনী, বিবিধ বৃত্তান্ত বয়ান শেষে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, নাম-দাম-পছন্দে কোনোটিতে আমার হার হয়েছে কি না?

স্ত্রীর মুচকি হাসিতেই আমি যেন কম দামে ভালো, তাও আবার বিদেশি শাড়ি কেনার গৌরবে গৌরবান্বিত হতে চলেছি।

তবুও মুখ ফুটে প্রিয়তমার কাছ থেকে শুনতে চাই। তার জন্য কেনা এ শাড়ি পছন্দ হয়েছে কি না।

অনেক জোরাজুরির পর স্ত্রীর উত্তর, দুইশ টাকায় পাওয়া যায় এই প্লাস্টিক! এই পলিয়েস্টার শাড়ির জন্য কেনই বা আটশ টাকা খরচ করতে গেলে?

লজ্জায় সেদিন আমার মুখ লাল হয়ে গেলেও বৌ আমার সেই শাড়িটি এখনো মাঝে মধ্যে গায়ে জড়ায়। আর শাড়ি কেনার সেই বীরত্ব গাথা আজো আমাদের সুখের সংসারে নির্মল আনন্দ ছড়ায়।

পাহাড়তলি, চট্টগ্রাম থেকে

থার্মি ফাস্ট নাইট

– মাধবী

থার্মি ফাস্ট নাইট। সারাদিন জুড়ে ক্যাম্পাস সাজলো। প্রতিটা হলে হলে লাইটিং হলো। এ যেন এক অজানা উৎসবের ব্যাপক আয়োজন। প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট রহস্যময়ভাবে চলাফেরা করছে। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে প্রায় এক বছর। জীবনের অনেকখানি দেখা হতো না যদি এই বিদ্যাপীঠের সর্বোচ্চ পর্যায়ে না আসতাম। আমি কখনো ওই সব উৎসব পছন্দ করি না যে উৎসবে আমার আত্মসম্মান নিয়ে বিবেক আমার প্রশ্ন করবে। এ সূত্রেই আমি থার্মি ফাস্ট এড়িয়ে চলি। সারাদিন রুমেই ছিলাম অনেকটা মনমরা হয়ে। কারণ সবাই বাইরে। একা নিঃসঙ্গতায় ভুগছিলাম। সন্ধ্যার কিছু আগে হঠাৎ আমার রুমমেটরা হাজির।

কি ব্যাপার, সবাই এতো মজা করছে আর তুই চুপচাপ রুমে বসে আছিস?

কি করবো, বাইরে যেতে ভালো লাগছে না।

ভালো লাগছে না মানে? ওঠ তাড়াতাড়ি। চল আমাদের সঙ্গে, দেখবি ভালো লাগছে।

শোন, আজ বাইরে যাওয়ার আমার কোনো ইচ্ছা নেই। তাছাড়া তোরা রাত করে ফিরবি। আমার মাথা ব্যথা করছে, তোদের সঙ্গে তাল দিতে পারবো না।

বুঝি, সব কথা বুঝি। ওইসব অজুহাত দিয়ে একা রুমে থাকবেন আর মন খারাপ করবেন এ হয় না। এই নিন শাড়ি। আপনি তো আবার পশ্চিমা কালচার পছন্দ করেন না। তাই শাড়ি পরেই চলেন। পুরোটা ওদের অনুরোধেই হলো। বলা বাহুল্য, ওদের সামলানোর কোনো পথই আমার খোলা ছিল না। বাধ্য হয়ে শাড়ি পরলাম। ওরা কথা দিয়েছে, আমাকে নয়টার মধ্যে হলে পৌঁছে দেবে। তাই অনেকটা রাজি ছিলাম। শাড়ি পরলে একটা মেয়েকে সত্যিকার মেয়ে বলে মনে হয়।

শাড়ি জিনিসটাই আসলে জাদু জানে। শরীরে জড়িয়ে নিলে কেমন যেন এক ধরনের অনুভূতি হয়। মনে মনে চাপা একটা খুশি কাজ করে। তখন সব মেয়েই চায় নিজের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলতে। আমারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে লিপস্টিক, টিপ, গহনা পরলাম। নিজের কাছে নিজেকেই ভালো লাগছিল।

সন্ধ্যা সাতটার দিকে বের হলাম। নাশতা খেয়ে তারপর ঘুরবো। তাই স্পাইসের দিকে রওনা দিলাম। ক্যাম্পাসের মধ্যে স্পাইস ভালো ফাস্ট ফুডের দোকান। পথে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা। গল্প করতে করতে এগিয়ে চললাম। যখন স্পাইসে বসলাম দেখি আমার পাশে একজন বন্ধু ছাড়া কেউ নেই। অগত্যা দুজনের খাবারই অর্ডার দিলাম। আমরা খাচ্ছি। হঠাৎ মনে হলো আমার দিকে কেউ তাকিয়ে আছে। সামনের দিকে তাকলাম। দেখি সাতাশ আটাশ বছরের একজন পুরুষ অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার পাশের বন্ধুকে বললাম। সেও দেখে একই অবস্থা।

একজন মানুষ যদি নির্লজ্জের মতো অপলক দৃষ্টিতে আরেকজনের দিকে তাকিয়ে থাকে তাহলে যার দিকে তাকায় তার সংকোচ হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমি চাইলাম দ্রুত খাওয়া শেষ করে চলে আসতে। হঠাৎ দেখি লোকটা হাসছে। এবং আমার দিকে তাকানো অবস্থাই পাশে রাখা ব্যাগ থেকে শাদা, গলা চিকন, পেট ভারী একটা বোতল বের করলো এবং মুখ খুলে তরল জাতীয় পদার্থ মুখে ঢালতে লাগলো। মুহূর্তে বোতল খালি করে ফেললো এবং আবারও একটা তৃপ্তির হাসি হাসলো।

ওই মুহূর্তে নিজেকে কি মনে হলো জানি না। অনুভূতি বলতে বুঝলাম, আমার হাত পা নাড়তে পারছি না, মুখ দিয়ে কথা বলতে পারছি না। জীবনে এই প্রথম কাউকে চোখের সামনে মদ পান করতে দেখলাম। শুধু মদ খেয়ে যদি লোকটা ফিরে যেতো, কথা ছিল না।

তারপরই খেয়াল করলাম লোকটা এক এক করে প্রথমে টি-শার্ট, তারপর গেঞ্জি খুলে ফেললো এবং ব্যাগ থেকে রেজর জাতীয় কি যেন বের করে মুখ, সারা শরীরে ঢালাতে লাগলো। এসব দেখে পালাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু দেখি লোকটা পলকহীনভাবে আমাকে দেখছে। হঠাৎ লোকটা উঠে দাড়ালো। ভয়ে আমি চিৎকার করবো ভাবলাম। লোকটা বাইরে যাচ্ছে দেখে থেমে গেলাম। বাইরে গিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। তার জামা-কাপড়, ব্যাগ সেখানেই রইলো।

এ অবস্থায় কিছু চিন্তা না করেই সোজা দৌড়ে চলে এলাম রাস্তায় এবং একটা রিকশা নিয়ে হলে ফিরে এলাম। ঘড়ি দেখলাম আটটা বিশ মিনিট। টেবিলে বসে পড়লাম আর চিন্তা করলাম, আজ যদি আমি শাড়ি না পরতাম তাহলে হয়তো ওই শয়তানটা আমার দিকে তাকিয়ে চোখের ক্ষিপ্ত মেটাতো না। যদি শাড়ি না পরতাম তাহলে হয়তো পাজিটা আমার দিকে তাকিয়ে ওপেন ড্রংক করতো না। আজ যদি শাড়ি না পরতাম তাহলে এই রকম একটা বাজে পরিস্থিতির শিকার হতাম না। দুই চোখ

ভরে জল এলো। ভাবলাম, আমি যদি আজ বাঁধন হয়ে রুমে ফিরতাম, কে নিতো আমার অপমানের দায়দায়িত্ব? হয়তো পরদিন দৈনিকে বড় অঙ্করে ছাপা হতো থার্ট ফাস্ট নাইটে তরুণী লাঞ্চিত। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া যে, সে আমার মান সম্মান বজায় রেখেছে। তাই এখন শাড়ি বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতার কথা কেউ বললেই মনে পড়ে সেই ভয়াবহ স্মৃতি।

সাভার, ঢাকা থেকে

হারানো বৌ

– সাজু হোসেন

হলুদ শাড়ির প্রতি দুর্বলতা ছোটকাল থেকেই। কেন তা জানি না। গ্রামাঞ্চলে নববধূরা বিয়ের পরের দিন হলুদ শাড়ি পরে। লাল পাড়, হলুদ জমিনের শাড়ি পরা বৌ অপরূপা। তাই কেউ বিয়ে করলে বিয়ের পরের দিন যেতাম বৌ দেখতে। নববধূর গায়ে হলুদের বর্ণ। মুখে প্রসাধন, হলুদ শাড়িতে সুসজ্জিত বধূকে দেবী মনে হতো। মনে হতো সে যদি আমার বৌ হতো! হলুদ শাড়ি প্রীতি তবে রমণী ভীতি এটা ছিল সকলের জানা।

তাই নববধূ দেখতে যাওয়ার অস্বীকৃতি মিলতো না কখনো। একবার পাশের গ্রামের এক ডাক্তার সুদূর সিলেট থেকে বিয়ে করে বৌ আনলেন। চারদিকে হই চই সুন্দরী অপরূপা বৌ। আমরা কয়েক বন্ধু গেলাম বৌ দেখতে। গিয়ে দেখলাম ভিন্ন রঙের শাড়ি পরা। অর্থাৎ হলুদ শাড়ি পরেনি। তাই বৌ আমাদের পছন্দ হলো না। আমরা কূটবুদ্ধি করলাম বৌকে এবং ডাক্তারকে শাস্তি দিতে হবে। ডাক্তার সম্পর্কে ভাই হয়। তাই নববধূকে ভাবী সম্বোধন করে আলাপ জমালাম। আলাপ প্রসঙ্গে এক বন্ধু আরেক বন্ধু ভাবীকে শুনিয়ে বলছে, আমাদের আগের ভাবীর চেহারা বেশি সুন্দর ছিল। এ কথা শোনা মাত্রই কাদো কাদো গলায় ভাবী জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ভাই কি সত্যি আরেকটি বিয়ে করেছিল? আমরা অবুঝ বালকের মতো হ্যাঁ বললাম।

ভাবী তো রেগেমেগে আগুন, সিলেটি ভাষায় কি বললো কিছুই বুঝলাম না। তবে আমাদের ওষুধে যে কাজ হয়েছে তা বুঝে এক মুহূর্ত দেরি না করে কেটে পড়লাম। পরে শুনেছি দুই দিন ওই ভাবী খাননি, এমনকি কথাও বলেননি। কেউ তাকে বোঝাতে পারেনি যে, ঘটনাটা মিথ্যা। ডাক্তার সাহেবের পরিবারের লোকজন আমাদের অভিভাবকদের কাছে বিচার দিল। এখন আমাদের ভাত বন্ধ হওয়ার উপক্রম। পরে আমরা অভিভাবকদের সামনে দুষ্টমির ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম। এ ঘটনার পর থেকে কারো বৌ দেখতে যাওয়ার ওপর ১৪৪ ধারা জারি হলো।

ক্লাস নাইনে পড়ার সময় উক্ত ঘটনা ঘটে। কিন্তু তখন যে নিজের বৌ দেখার স্বপ্ন মনের মধ্যে উকিঝুকি মারছে। পরের বৌ দেখার ইচ্ছা জাগে না। এক সহপাঠীকে খুব পছন্দ করতাম। মনের কথা বলতেই রাজি হলো এবং শুরু হলো বৌ ডাকা। একই পাড়ায় আমাদের বাড়ি হওয়ায় দুই পরিবারে আমাদের অবাধ যাতায়াত ছিল। তাকে হাজারো অনুরোধ করেও শাড়ি পরাতে পারিনি। হয়তো পরেছে, আমাকে দেখায়নি। শাড়ি পরার কথা বললেই সে বলতো, তুমি শাড়ি কিনে দিলে পরবো।

কিন্তু তাকে শাড়ি কিনে দেবো কিভাবে? ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর জেলা সদরে একই কলেজে ভর্তি হলাম। আমি মেসে আর সে থাকে হস্টেলে। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে তাকে বললাম, তোমাকে একটি শাড়ি কিনে দেবো। বিনা বাক্যে রাজি হলো এবং এক সঙ্গে মার্কেটে গিয়ে শাড়ি কিনলাম। দীর্ঘ প্রেম জীবনে কখনো তার উষ্ণতা পাইনি। এক সঙ্গে যাতায়াত করেছি ঠিকই তার কড়া শাসন, কঠিন ভাষণে সাহস পাইনি ছুয়ে দেখার। আমাদের প্রেম ছিল কাগজে কলমে। মুখের কথায়, চোখের ভাষায়।

তাই শাড়ি কেনার পর আমার মেসে যাওয়ার প্রস্তাবে রাজি হওয়াতে মনে একটা শিহরণ জেগে ওঠলো। অন্যদিকে ভয়ও লাগছিল। কারণ আমরা দোতলায় পাচ রুমের একটিতে থাকি, বাকিগুলোও ছাত্রদের দখলে। তবুও সাহস নিয়েই গেলাম। তখন বিকেল। রুমে এক রুমমেট ঘুমাচ্ছে। জেগে উঠে আমার পাশে বৌকে দেখে বুঝতে পেরেছে। এখন সময় আমাদের প্রেম করার এবং তার বাইরে যাবার। যাওয়ার সময় বন্ধুকে বললাম, দোস্তু তুই বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিবি যাতে কেউ বুঝতে না পারে এবং ঠিক এক ঘণ্টা পরে এসে খুলে দিবি। যেই কথা সেই কাজ।

বাইরে তালা, ভেতরে আমরা দুজন। নিজেকে রাজা রাজা মনে হয়েছিল যেন কোনো রাজ্য জয় করে রানীকে নিজের জন্য নিয়ে এসেছি। সে শুধুই আমার। কি করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এক বুক সাহস নিয়ে বললাম, তোমাকে একটু...

তার মৌন সম্মতি নিয়ে কপালে একে দিলাম প্রথম প্রেম চিহ্ন। তারপর শাড়ি পরতে বললাম। বৌ হলে কেমন লাগে দেখবো। কোনো কথা না বলে দাড়িয়ে আছে। তার গালে আলতো ছোয়া দিয়ে আবারও শাড়ি পরতে বললাম।

কিভাবে পরবো? আলাদা রুম নেই, এটাচড বাথরুম নেই।

ভাবলাম সত্যি তো। বাইরে যাবো তারও উপায় নেই।

সে রাগ করে বললো, আমি শাড়ি পরবো না, তুমি পরো।

তার রাগের ধরন বুঝে দ্বিতীয়বার এবং তারপর হাজারো চুমুতে দিশেহারা। শরীর কাপছে। কোনো কথা বলতে পারছি না। তবুও বললাম, তোমাকে শাড়ি পরিয়ে দেবো। একে একে সকল কাপড় খুলে অদক্ষ ও কম্পিত হস্তে বৌকে শাড়িতে জড়ালাম।

প্রকৃতির উল্টো কাজটি আমাকেই করতে হলো।

শাড়ি পরানোর পর দেখলাম কোনোটাই ঠিক হয়নি। শাড়ির ভাজ, কুচি সবই এলোমেলো। তা দেখে সে রেগেমেগে সব খুলে ফেললো। কৃত্রিম রাগে লাজুক চোখে তাকাতেই কখন যে হারিয়ে গেলাম দুজন টের পাইনি। বন্ধু দরজায় কড়া নাড়তেই সংবিৎ ফিরে পেলাম। শেষে সে বলছিল, তোমার বৌ যদি কখনো হারিয়ে যায়? নতুন যে আসবে তাকে কি এমন আদর করে বৌ বলে ডাকবে?

তার কথাই সত্যি। সে চলে গেছে। আজো আমি একা।

সাভার, ঢাকা থেকে

কিংকর্তব্যবিমূঢ়

– উদয়তারা ওয়াহিদ

শাড়িশ্রীতি আমার ছোটবেলা থেকেই। কেন জানি না বাবাও ব্যাপারটা সমর্থন করতেন। ব্যাস ক্লাস সেভেন থেকে আমার পোশাক হলো শাড়ি। শুধু স্কুল কলেজের ইউনিফর্ম ছাড়া আমার কোনো সালোয়ার কামিজ বা অন্য কোনো পোশাক ছিল না।

আমি তখন লালমাটিয়া কলেজে বি.এ পড়ি। বাসা কল্যাণপুরে। প্রতিদিন আমার যাওয়া আসার পথে আড়ং পড়ে। প্রায় দিনই কলেজ থেকে হেটে এসে আড়ংয়ে ঢুকে শাড়ি, থু-পিস ইত্যাদি দেখি। পছন্দ হলে কিনে ফেলি। তারপর রিকশা করে বাড়ি ফিরি। এটাই আমার রুটিন।

একদিন আড়ংয়ে গিয়ে শাড়ি দেখছি একটার পর একটা, পছন্দ হতে গিয়েও হচ্ছে না। এই অবস্থায় দেখি মদন মার্কা চেহারা নিয়ে একজন বিভিন্ন শাড়ির স্ট্যান্ডে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। শাড়ি দেখা বাদ দিয়ে অবাক হয়ে তার দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকাচ্ছি। ব্যাপারটা কিছুক্ষণ পর তিনিও খেয়াল করা মাত্র আমার সাহায্য চাইলেন, আমি যেন তাকে তিনটা জামদানি শাড়ি পছন্দ করে দিই। তাহলে তার ভীষণ উপকার হবে। তিনি আরো বললেন, তার বাসা বেশি দূরে নয়। তার মা-ই আসতেন শাড়ি কেনার জন্য। কিন্তু বাতের ব্যথার জন্য তিনি আসতে পারছেন না। হাতে সময়ও বেশি নেই। তাই তাকে আসতে বাধ্য হলো। শাড়ি কেনার পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় তিনি বেশ ঝামেলায় পড়েছেন। আমি যদি তাকে শাড়ি কিনতে সাহায্য করি তাহলে তিনি চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন।

তার বোনদের ছবি দেখে তিনটা জামদানি ত্রিশ মিনিটে পছন্দ করে দিলাম। তিনিও খুশি হয়ে বিশেষ প্যাক করে শাড়ি তিনটি আমেরিকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন বোনদের কাছে। যাওয়ার সময় ঠিকানা বিনিময় করলাম।

শাড়ি কেনার এক সপ্তাহ পর আমার রুটির প্রশংসা করে আমার সঙ্গে তিনি দেখা করতে চাইলেন। এভাবেই আমাদের প্রেমের শুরু। পেশায় তিনি ইঞ্জিনিয়ার, একমাত্র ছেলে, দুই বোন প্রবাসী, মা দেশ-বিদেশ করে বেড়ান। ছয় মাস ডেটিং। এরপর পারিবারিকভাবে আমাদের বিয়েটা হলো।

বিয়ের পরের দিন আমার স্বামী অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আমাকে অনুরোধ করলো, আমি যেন আর শাড়ি না পরি। শাড়ি পরাটা তিনি ভীষণ অপছন্দ করেন। আমার জন্য তিনি অনেক থু-পিস কিনে রেখেছেন। অতএব জলাঞ্জলি দিতে হলো নিজের ইচ্ছা এবং গ্রহণ করলাম স্বামীর পছন্দ। ছোটবেলা থেকে জমানো আলমারি ভর্তি শাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিই বা করার আছে আমার?

দারুসসালাম, মিরপুর, ঢাকা থেকে

চিঠি

- শেখ তরীকুল ইসলাম

এখন থেকে প্রায় দশ বছর আগে। আমি তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। বাবার ব্যবসায়িক কারণে থাকতাম চুয়াডাঙ্গা জেলার উথলি গ্রামে। উথলি শুধু গ্রাম নয়, বেশ উন্নত গ্রাম। উথলিতে রেল যোগাযোগ আছে। এটি একটি রেল স্টেশনও বটে।

ভালো ছাত্র হিসেবে পরিচিত ছিলাম সেখানকার সবার কাছে। এরপর সিক্স থেকে ফার্স্ট হয়ে যখন ক্লাস সেভেনে উঠলাম তখন চারদিকে আমার পরিচিতি আরো বেড়ে গেল। নতুন নতুন বাড়িতে যাবার সুযোগ পেলাম। এভাবে পপিদের বাড়িতে যাতায়াত শুরু হলো।

পপি আমার থেকে এক ক্লাস উপরে পড়তো স্থানীয় গার্লস স্কুলে। আর আমি পড়তাম উথলি বয়েজ স্কুলে। এক ক্লাস উপরে পড়ার কারণে পপিকে আপা বলে ডাকতাম। কাছাকাছি বাড়ি ছিল আমাদের। পপি ও আমি অধিকাংশ সময় বাড়ির সামনে খেলা করতাম, দৌড়াদৌড়ি করতাম। এভাবেই আস্তে আস্তে পপির প্রতি আমার দুর্বলতা সৃষ্টি হলো। পপিও আমাকে নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকতো। এমনকি প্রতিদিন বিকেলে পপি ও আমি সারা গ্রাম ঘুরে বেড়াতাম।

ভালো ছেলে আর বয়সে পপির থেকে ছোট ছিলাম বলে কেউ কিছু মনে করতো না। আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গল্প করে সময় কাটাতাম। তবে দুর্ভাগ্য আমার। কিছুদিন পরে বাবা ব্যবসা গুটিয়ে চলে এলেন আমার দাদাবাড়ি বাগেরহাটে। হঠাৎ করেই চলে এলাম। চলে আসার আগে পপির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সে খুব দুঃখ করলো। আমারও প্রচণ্ড খারাপ লাগছিল তাকে ছেড়ে আসতে। কিন্তু কিছুই করার নেই। সে বললো, সারা জীবন তোমাকে মনে রাখবো। আমিও বললাম। বিদায় নিলাম। চলে এলাম বাগেরহাটে।

বন্ধু-বান্ধব সবাই একে একে বিদায় দিল। শেষ বিদায়ের পর বাগেরহাটে আটটি বছর কাটিয়ে দিলাম উথলির সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ ছাড়াই। কিভাবে যোগাযোগ করবো। কারোর ঠিকানা আনা হয়নি। কাউকে দেয়াও হয়নি। এমনকি পপিকেও। কিন্তু তাদের কাউকে ভুলিনি। আর পপিকে ভুলিনি একটি দিনের জন্যও।

২০০০ সাল। এইচএসসি পাস করে অনার্সে ভর্তির প্রস্তুতি নিছি। এমনি এক সময় আমার নামে একটি চিঠি আসে। খুলে দেখি উথলি থেকে আমার প্রিয় বন্ধু ফারুকের। আমার বাবার এক ব্যবসায়িক সহযোগীর কাছ থেকে ঠিকানা পেয়ে লিখেছে। অদ্ভুত এক আনন্দ নিয়ে কয়েকবার পড়লাম। আট বছরের সমস্ত কথা লিখেছে। আমিও সব কিছু জানিয়ে যথার্থ উত্তর দিলাম। এভাবে আটটি বছর পর আবার যোগাযোগ তৈরি হলো। আমার কাছে ফারুক এলো। পপির কথা জানলাম। সেও তখন ডিগ্রিতে ভর্তি হয়েছে। তার মানে এক বছর কোথাও গ্যাপ গেছে।

২০০০-এর শেষ দিকে আমিও বেড়াতে গেলাম উথলি দুই দিনের জন্য। চলে আসার দিন সকালে পপিদের বাড়িতে গেলাম। তারা কেউ আমাকে চিনতে পারেনি। আমার নাম, ঠিকানা ও পূর্ব পরিচয় জানালাম। এবার তারা চিনলো। পপি তো অবাক!

ড্রয়িংরুমে বসে অনেকক্ষণ গল্প হলো। তবে তার সঙ্গে আট বছরের সুখ-দুঃখের আলাপ করতে গিয়ে বুঝলাম, সে কোনো কিছু গোপন করছে। চলে এলাম পুনরায় যাবার আমন্ত্রণ নিয়ে। ফারুককে জানালাম না কিছুই। কারণ যদি সে কিছু মনে করে। আসার সময় পপি একটা ঠিকানা দিয়েছিল। সেই মতো চিঠিপত্র দেয়া-নেয়া করতাম। আবারও দুর্বল হয়ে পড়ি তার প্রতি। কিন্তু তাকে এখনো তা জানাইনি। আমাকে তেমন কিছু সে বলে না। এভাবে চলতে চলতে এলো ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০১। তার ঠিকানায় পাঠালাম প্রিয় একটি শাড়ি, কিছু গোলাপ ও কিছু চকলেট এবং যাযাদির বিশেষ সংখ্যা। বিপত্তিটা ঘটলো সেখানেই।

উপহার সামগ্রীর মধ্যে ছোট চিরকুট ছিল - তোমাকে ভালো লাগে ১৯৯২ থেকে। তোমাকে ভালোবাসি ২০০১ থেকে। আর তোমার অপেক্ষায় থাকবো আজীবন।

চিঠির উত্তর এলো না পনেরো দিনেও। আমার তো সময় কাটে না, কখন উত্তর পাবো। একেকটা দিন কিভাবে পার করি তা বোধহয় বিধাতাই শুধু জানে। এভাবে এক মাস যাওয়ার পর পুনরায় লিখলাম। এবারও ফলাফল শূন্য। তারপর আবার। কিন্তু কোনো উত্তর নেই। এবার ধরে নিলাম কোনো সমস্যা হয়েছে। আমার তো টেনশনে ঘুম হারাম। সারাক্ষণ চিন্তা, কি হলো, কি করি।

বাধ্য হয়ে ফারুককে সব কিছু জানিয়ে এবং একটা মোবাইল নাম্বার দিয়ে চিঠি লিখলাম। ফারুক চিঠি পেয়ে আমাকে কল করলো এবং আরো বিস্তারিত তথ্য আমার কাছ থেকে জেনে নিল। তবে সঙ্গে এও জানালো, তাকে না জানিয়ে এসব করা ঠিক হয়নি। কিন্তু অত্যন্ত ভালো বন্ধু বলে যথাসম্ভব সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিল। তার কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। তবে তার ঠাট্টা মারা হাসি শুনে বুঝলাম কিছু যেন লুকোচ্ছে। তবে সে কিছুই বললো না।

এরপর ফারুকের ফোনের অপেক্ষায় থাকলাম। সাত দিন পর ফারুক জানালো দুই একদিনের মধ্য পপি আমাকে মোবাইলে সব কিছু জানাবে। তাকে জোর করলাম। কিন্তু ফারুক কিছুই বললো না। তবে অনেক পীড়াপীড়ির পর জানালো, পপি বিবাহিতা এবং আমার জন্য পপির বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে।

আমার মাথায় যেন বাজ পড়লো। পপির সমস্ত চিঠি খুলে উল্টে-পাল্টে দেখলাম কেথাও লেখা নেই যে সে বিবাহিতা। চিন্তায় রাতের ঘুম হারাম। এভাবে এক দিন গেল। চিন্তা করতে লাগলাম আমার জন্য তার কি ক্ষতি হতে পারে। আমার সব চিঠিপত্র আর উপহার কি তার স্বামী জেনে গেছে। আর সে জন্যই হয়তো তার দাম্পত্য জীবনে অশান্তি নেমেছে।

পরের দিন দুপুর দুটায় পপির ফোন এলো। আমি দ্রুত সব কিছু জানতে চাইলাম। পপি কান্না কান্না কর্তে যা বললো তার সারাংশ এ রকম :

পপির বিয়ে হয়েছে এক বছর আগে। কিন্তু বিয়ে হলেও সংসার জীবনে পপির চরম অসুখী। তার স্বামী ভ্যাগাবন্ড ক্লাসের। কোনো কাজকর্ম করে না। সারাদিন ঘোরাঘুরি করে। রাতে চলে যায় মদের আড্ডায়। মদ-জুয়া এগুলো তার স্বামীর নিত্যসঙ্গী। গভীর রাতে মদ খেয়ে অসম্ভব গালিগালাজ এবং মারধর করতো পপিকে। এসব ঘটনা উভয় পরিবারের সবাই জানে। কিন্তু কোনো প্রতিকার নেই। স্বামীর এ ধরনের চরিত্রের কথা কাউকে বলা যায়?

তাই আমাকেও বলেনি। তাছাড়া ছোটবেলার সেই দুর্বলতা হঠাৎ করে দেখা হওয়ায় আরো তীব্র হয়ে ওঠে। এসব মিলিয়ে আমাকে স্বামীর কথা জানায়নি। এরপর আমার চিঠি যখন পাই তখন তার খুব ভালো লাগে। নতুন করে ভালোবাসতে ইচ্ছা করে আমাকে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। কিন্তু আমার চিঠি দেয়া যাতে বন্ধ না হয় সে জন্য কখনো স্বামী, সংসারের কথা বলেনি। প্রচণ্ড অশান্তির মধ্যে আমার চিঠি পেলে তার দুঃখ-কষ্ট সাময়িকভাবে ভুলে যেতো। তাও শেষ রক্ষা হলো না। আমার সঙ্গে তার চিঠি দেয়া-নেয়াটা ছিল পারিবারিকভাবে গোপনে। শাড়ি, চকলেট, গোলাপসহ যখন ছোট চিরকুট পায় তখন সে এতোটাই আবেগাপ্লুত হয় যে, ভুলে যায় এ শাড়িটা আমার উপহার দেয়া এবং যা গোপনে রাখতে হবে।

সে শাড়িটা পরে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায় মনের আনন্দে। ঘনিষ্ঠ কিছু বান্ধবীকে বলে আসল ঘটনা। এরপর ভুলক্রমে তার এক ননদকে বলে। ব্যস, স্বামীর কাছে পৌছে যায় ঘটনাটা। সে যখন আমাকে ধন্যবাদসহ চিঠি লিখছিল তখন তার স্বামী ঘরে প্রবেশ করে। তখনো ওই শাড়ি পরনে ছিল। শুরু হলো প্রহার। মারের চোটে বাধ্য হলো সব কিছু বলতে। কিন্তু আমার ঠিকানাটা চেপে গেল। এরপর ওই শাড়ি এবং সমস্ত চিঠি পুড়িয়ে তার ডান হাতটা জ্বলন্ত আগুনের ওপর ঠেসে ধরে। বেঁট দিয়ে কপালে দেয় ভীষণ এক আঘাত। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান। সেখান থেকে হাসপাতাল। সাত দিন হাসপাতাল থেকে শ্বশুরবাড়ির লোক আবার নিয়ে গেল। এবার তাকে রাখা হলো গৃহবন্দী। সারাদিন বাইরে বের হওয়া যায় না। বাইরের কাউকেও দেখা করতে দেয়া হয় না। পপির দুঃখ কষ্টের কথা শুনে অবশেষে সহ্য করতে না পেরে তার বাবা-মা তাকে ডিভোর্স দিতে বলে। গতকাল ডিভোর্স নিয়ে বাড়ি ফিরেছে। আর কোনোদিন বিয়ে করবে না পপি। কিন্তু কিভাবে বাকি জীবন কাটাবে তা জানতে চায়।

আমি কিছুই বলতে পারি না।

এবার বি.এ পরীক্ষা দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে পপি।

মাঝে মধ্যে ফোন করে। আমিও করি। কিন্তু তার জীবনের এতো বড় দুঃখজনক ঘটনার জন্য কখনো আমাকে দায়ী করে না। সময় কাটানোর জন্য চাকরির চেষ্টা করছে। তবে এখনো মাঝে মধ্যে জানতে চায়, জীবনের এতোটা পথ কিভাবে চলবে?

নিশ্চুপ থাকি।

এম.টি. রোড, খুলনা থেকে

নীল পরী

- এ. হোসেন

শিলার আগামীকাল অংক পরীক্ষা। একটানা ছয় সাতটা অংক কষে দিয়ে একটু আড়মোড়া ভেঙে পেছনে তাকাতেই ধক করে উঠে বুকটা। একি! এ কে? কোনো পরী-টরি নয়তো? কিন্তু না, পরীরা তো পৃথিবীতে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। সেই কবে। তাহলে? নীল শাড়ি, শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করা রাউজ ও লিপস্টিক।

চোখ জোড়া ঘুম জড়ানো ভাসা ভাসা। বারান্দা ও মূল ঘরের মধ্যবর্তী দরজায় হেলান দিয়ে, হাত জোড়া বুকের কাছে আড়াআড়ি ভাজ করে এনে দাড়িয়ে আছে সে। চোখ জোড়া এদিকেই প্রসারিত। অপলক, অনড়, নির্বাক। আমি চোখ ফিরিয়ে শিলার দিকে তাকালে ও আমার সাহায্যে এগিয়ে আসে।

আমার খালাতো বোন জলীআপু, ঘাউপাড়ায় বাড়ি, দুলাভাই ইওরোপে থাকেন।

আশ্চর্য! মুন্সিগঞ্জের এ গোয়ালপাড়া এলাকায় আছি আজ প্রায় দুই বছর হয়। কোন বাড়িতে সুন্দরী ছাত্রী আছে, সুন্দরী বৌ আছে কার ঘরে, সব আমার নখদর্পণে। কিন্তু এ পরীকে তো দেখিনি কোনোদিন। এরপর গুণে গুণে এক সপ্তাহ পর শিলাকে পড়াতে গেলে সে জানায়, সেই পরী নাকি আগের দিন তলব করে গেছে আমাকে। হার্টবিট বেড়ে যায় আমার।

কেন?

জানি না। আপনি এলে আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছে। শিলা এরপর আমাকে সেই পরীর খাস কামরায় নিয়ে যায়। সেই ড্রেস। নীল শাড়ি। ঘুম জড়ানো ভাসা ভাসা চোখ। তার দিকে হা করে তাকিয়ে ছিলাম কতোক্ষণ জানি না। হুশ ফিরলো যখন সে মুখে হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে বললেন, দাড়িয়ে কেন? বসো। তুমি করে বললাম, কিছু মনে করো না। তাছাড়া তুমি আমার ছোটভাইয়ের বয়েসী।

উত্তর দিলাম, না না আপনি আমাকে তুমি করেই বলবেন। ক্লাস ফাইভ-এ পড়ুয়া ছোট বোন মিলি এবং জলীআপু এই তাদের সংসার। যাহোক, জলীআপু সেই পরী। তার বোন মিলির পড়ানোর দায়িত্বভার আমার হাতে তুলে দেন।

এরপর সেই যে শুরু, একটা দিনের জন্যও কোনোদিন মিলিকে পড়াতে যাওয়া মিস দিইনি। জলীআপুও হয়তো ব্যাপারটা বুঝতে পারেন। তিনিও দিন দিন আরো বেশি ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে লাগলেন। মিলিকে পড়ানোর সময় আমার পাশে এসে বসেন, চা করে দেন। প্রায়ই কলা, আপেল আনিয়ে রাখেন মিলিকে দিয়ে। পড়ানো শেষে না খেয়ে উঠতে দেন না। তার শরীরের গন্ধ আমাকে এলোমেলো করে দেয়। কিন্তু সঙ্কোচে তাকাতে পারি না তার শরীরের দিকে। কে জানে, জলীআপু হয়তো ছোট ভাইয়ের দৃষ্টিতেই দেখেন আমাকে, অন্য কিছু নয়। আমিও তাকে বড় বোনের আসনেই বসিয়েছি। অথচ তার মায়াবী শরীরও টানে আমাকে। একদিকে চুষকের মতো তার শরীরের আকর্ষণ, অন্যদিকে পাপবোধ আমাকে দিন দিন উদভ্রান্ত করে দেয়।

সামনে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা। অথচ টেবিলে ছড়ানো বইগুলোর ওপর ধূলির আস্তরে নাম লেখা যাবে স্পষ্ট অক্ষরে। ওগুলো ছুতেও ইচ্ছে করে না, বিকর্ষণ করে। কলেজেও যাওয়া হয় না এখন। শেষবার কবে কলেজে গিয়েছিলাম মনে করতে পারবো না। চাতক পাখির মতো সারাদিন প্রতীক্ষা, কখন পাচটা বাজবে। কখন মিলিকে পড়াতে যাবো। কখন জলীআপুর শরীরের সুবাস এসে ছুয়ে যাবে আমাকে।

এক বৃহস্পতিবার বিকেলে জলীআপু বললেন, আগামীকাল সকালে তুমি কি একটু আসতে পারবে?

আমি তার কথা শুনে তো আনন্দে উদ্বেলিত। জলীআপু বললে তার জন্য সারাদিন গ্রীষ্মের খরতাপে ঠায় দাড়িয়ে থাকতে পারি নির্দিধায়। এমনকি তিনি যদি আগুনে ঝাপ দিতে বলেন তাও তুচ্ছ মনে হবে

আমার কাছে এমন অবস্থা তখন। সুতরাং কেন, কোথায় জাতীয় প্রশ্ন করে কালক্ষেপণ না করে বললাম, অবশ্যই পারবো, তাছাড়া আগামীকাল তো কলেজ বন্ধ।

জলীআপু যেতে বলেছেন, কেন, কোথায় এ রকম হাজারও ভাবনা চোখের পাতাযুগল এক করতে দেয়নি সারা রাত। বা সাহারা মরুভূমি পাড়ি দেয়াও হয়তো ওই রাত পাড়ি দেয়ার চেয়ে সহজতর হতো আমার কাছে। গোসল সেরে সামান্য ফাস্ট ফুড খেয়ে যখন প্রস্তুত তখন দেয়াল ঘড়িটার ঘণ্টা ও মিনিট উভয় কাটা সাতের ঘর পেরিয়ে সামান্য একটু এগিয়েছে। হায়, এতো কম সময়! আরো কিছুক্ষণ বিক্ষিপ্তভাবে এদিক-ওদিক পায়চারী করার পর ধীর পায়ে এগিয়ে যাই জলীআপুর বাড়িতে। দরজা খুলে জলীআপু আমার অধঃপতন দেখে অবাক হয়ে যান। শাসনের স্বরে বলেন, এতো সকালে তোমাকে আসতে বলেছে কে, হ্যা?

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে কাচুমাচু ভঙ্গিতে তার পিছু পিছু গিয়ে বসি। মিলি দৌড়ে এসে সালাম দেয়। জলীআপু ওকে নিয়ে ভেতরে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে একটা ভ্যানিটি ব্যাগ কাধে ঝুলিয়ে এসে বলেন, এসো, তোমাকে নিয়ে আজ মার্কেটে যাবো।

আমি দুটো রিকশা নিতে চাইলেও জলীআপু এক রিকশাতেই উঠতে বলেন আমাকে। একপাশে জলীআপু, অন্যপাশে আমি। মাঝখানে দেয়াল মিলি। মিলির কাধ ভেদ করে জলীআপুর একটি হাত আমার বাম কাধের ওপর আশ্রয় নেয়। আমি শিহরে উঠি।

শহরময় ঘুরে অবশেষে জলীআপুর পছন্দের শাড়ি পাওয়া গেল একটা দোকানে। আবার সেই হালকা নীল শাড়ি যেই শাড়িতে প্রথম মর্ত্যের মাটিতে পরীর আবির্ভাব দেখেছিলাম।

নীল জমিনে সোনালি কারুকাজ।

এরপর জলীআপুকে নামিয়ে দিয়ে আমার ভাড়াটে রুমে চলে আসি। দুপুর একটা চমৎকার ঘুম হয়। এরপর পুনরায় গোসল সেরে আবার সেই অনিবার্য গন্তব্যের পথে পা বাড়ানো।

মিলি নেই শুনে মনটাই খারাপ হয়ে যায়। পরীক্ষা শেষ হওয়ায় সে আজ দুপুরে মায়ের কাছে চলে গেছে। বের হওয়ার জন্য পা বাড়াতেই জলীআপু প্লেটে করে কিছু আপেল নিয়ে এসে বলেন, একি, কোথায় যাচ্ছে! বসো।

মিলি তো নেই।

এরপর জলীআপু একটা কেমন যেন হাসি দিয়ে বলেন, মিলি নেই তো কি হয়েছে? জলীআপু আছে না! বসো বলছি।

আমি লজ্জা পাই। জলীআপু প্লেট এগিয়ে দেন। খাওয়া শেষে উঠতে চাইলে জলীআপু বলেন, এখন কিছু মারবো তোমাকে। চুপচাপ বসো।

মেঘ না চাইতে বৃষ্টি বৃষ্টি একেই বলে।

আমাকে যে শাড়ি কিনে দিলে ওটাতে আমাকে কেমন মানায় দেখবে না?

আমি মাথা নিচু করে বসে থাকি। জলীআপু বলেন, তুমি বসো, আমি ওটা পরে আসছি।

প্রায় দশ মিনিট পরে জলীআপু সেই নীল শাড়ি পরে আমার সামনে এসে দাড়ান। গায়ে দামি পারফিউমের গন্ধ। ঠোটে নীল লিপস্টিক ভেজা ভেজা। শাড়ির আচল কোমরে বাধা, ম্যাচ করা নীল ব্লাউজ। ব্রা পরেনি বলে স্তন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। স্লিভলেস ব্লাউজ। দুখণ্ড মাংসপিণ্ড যেন বেরিয়ে আসতে

চাইছে। নগ্ন বগলে পাউডার মেখেছেন জলীআপু। আমার মাথা গরম হয়ে যায়। চোখ, কান, মুখ লাল হয়ে ওঠে। শরীরের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আমি আর তাকাতে পারছিলাম না। জলীআপু এক রহস্যময়ী হাসি দিয়ে আমার পাশে বসেন।

কি ইয়াং বয়, বললে না তো নতুন শাড়িতে আমাকে কেমন মানিয়েছে?

হঠাৎ কি যে হয় আমার, চট করে জলীআপুর শাড়ির আচল ধরে টান মারি। আশ্চর্য! জলীআপু কোনো বাধা দেন না। তিনিও কি তাহলে জ্বলছিলেন এতোদিন আমারই মতো অব্যক্ত বেদনায়। জলীআপুর দীর্ঘ দিনের তৃষ্ণার্ত ঠোট দুটি তৃষ্ণায় ছটফট করে। এরপর নরনারীর খেলায় মেতে উঠি আমরা।

তারপর আরো দুই মাস আমরা একে অপরের সংরক্ষিত এলাকায় অবাধে বিচরণ করি। কিন্তু পাড়া প্রতিবেশী দিন দিন আমাদের সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। জলীআপুর স্বামী ইতিমধ্যে দেশে আসেন। ততোদিনে মিলিকে পড়ানোর চাকরিটা আমার চলে গেছে।

তারপর! আরো মাস খানেক পরে সেই উদার ভদ্রলোক (জলীআপুর স্বামী) জলীআপুকে নিয়ে আমার রুমে আসেন। ততোদিনে আমার বৈরাগী অবস্থা। দেয়াল জুড়ে রক্ত অক্ষরে জলী নাম আর উকোখুকো অবস্থা দেখে জলীআপু আচলে মুখ ঢেকে জল লুকান। পরদিন ভদ্রলোক নীল শাড়ির সেই নীল পরীকে নিয়ে উড়াল দেন ইওরোপের পথে।

মুন্সিগঞ্জ থেকে

জোনাকির উপহার

– অদিতি নাসিআত

শাড়ি!

ব্যাগ গোছানোর সময় বেশ কয়েকবার মনে হয়েছিল কথাটা। কিন্তু প্রতিবারই নিজের দিকে বাকা দৃষ্টি হেনেছি। মেয়েদেরকে নিয়ে এই এক ঝামেলা। মানুষ সংখ্যা একজন তো কি হয়েছে! পেছন পেছন এক হাতি বোঝাই জিনিসপত্র নিতে হবে! মনের পর্দায় রিওয়াইন্ড করে এনেছি হিথরো এয়ারপোর্টের সেই দৃশ্য। লাগেজের ওজন বেশি হওয়ায় চারশ আশি পাউন্ড চার্জ হয়েছিল। শত অনুনয়-বিনয় আর এই কালো মুখের হাসি দিয়েও কোনো লাভ হয়নি। সম্বল ছিল ষাট পাউন্ড মোটে। লেফট লাগেজে সাধের জিনিসপত্র লেফট করতে হয়েছিল। তারপরও যদি শিক্ষা না হয়। মাত্র তো দুদিনের যাত্রা। দুখানা সালায়ার কামিজ নিয়েই অবশেষে রওনা হলাম বগুড়া।

চমৎকার এই বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট। রাস্তাগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা নব্বই ডিগ্রি কোণে বিছানো। গাছ দিয়ে সাজানো চারদিক। দুই দিনের টুরটা সার্থক হবে। স্বামী জানালেন আমার টুরটা আসলেই আনন্দময় হবে। কেননা এরই মাঝে আছে এক তাম্বুলা নাইট। তাম্বুলা নাইট বেশ মজার অনুষ্ঠান। পুরো পরিবারসহ অফিসাররা সমবেত হন। বাচ্চাদেরকে নিয়ে হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, তারপর বিশাল খাওয়া দাওয়া। সবশেষে হয় তাম্বুলা খেলা। খেলাটা হাউজি ছাড়া কিছু নয়। হাউজি খারাপ শোনায়। পোশাকি নাম তাম্বুলা...। চমৎকার। সেই খেলায় জেতার টাকা দিয়ে হয় সবাইকে

আইসকুম আর কোক খাওয়ানো। নির্মল আনন্দের এক অনুষ্ঠান। তা আমি থাকতে থাকতে তাম্বুলা নাইট। সেতো ভারী মজার হবে।

ক্যান্টনমেন্টের যে কোনো অনুষ্ঠানে মিসেসদের পোশাক হলো শাড়ি। শাড়ি যে আনা হয়নি! বগুড়ার কাছেই তো রাজশাহী। এ শহরেও রাজশাহী সিন্ধু মিলবে নিশ্চয়ই। শহর থেকে দেখে শুনে একটা রাজশাহী সিন্ধু কেনা হলো। দেখে শুনে বলাটা ঠিক হচ্ছে না। আমার আর দেখাশোনা কি। এসব দেখে শুনে সাজগোজের ব্যাপারে যথেষ্ট বদনামের ভাগিদার আমি। আমার নিজস্ব পরিচিত পরিমণ্ডলে সাজগোজের সুযোগই মেলে না। সেমিনারের লেজ হিসেবে লাঞ্চ। এরূপ কিছু নিমন্ত্রণ পাই বটে। তা সেসব নিমন্ত্রণে গায়ে হোয়াইট কোটখানা চাপিয়ে গেলেই চলে।

হোয়াইট কোটের নিচে পোশাকের দিকে কারো নজর থাকে না। যা দুই একটা বিয়ের নিমন্ত্রণ পাওয়া যায় তাতে আর যাওয়া হয় না। জনগণ জানে হোয়াইট কোটধারীরা অতিশয় ব্যস্ত শ্রেণীর মানুষ। সামান্য বিয়ের নিমন্ত্রণ... নিজের বিয়েতেই তারা উপস্থিত থাকতে পারে কি না সন্দেহ! আসলেই কি তাই! না, এখন সে প্রসঙ্গ নয়। এখন শাড়ি প্রসঙ্গেই সীমাবদ্ধ থাকবো।

একখানা রাজশাহী সিন্ধু কেনা হলো। খুজে পেতে আধা অন্ধ একজন দরজিকে ব্লাউজ বানানোর অনুরোধ করা হলো। কারণ ১ মে উপলক্ষে বগুড়া শহরে সব দোকানপাট বন্ধ ছিল। শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে জুয়েলারিও কেনা হলো। কে বুঝবে এটা ইমিটেশনের গহনা! বিলেত ফেরত মানুষের সঙ্গে সকলে ওটা হোয়াইট গোল্ড ভাববে। তাছাড়া কেউ মুখ ফুটে জানতে চাইলে আমিও উত্তর দিতে দেরি করে দাত কেলিয়ে থাকবো। অপেক্ষা করবো তৃতীয় পক্ষ কেউ এসে যেন প্রসঙ্গটি অন্যদিকে টেনে নেয়।

কি চমৎকারভাবে সব ম্যানেজ হয়ে গেল! বেশ বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে নিলাম। চেহারাটা যেন তাজা দেখা যায়। তাম্বুলা নাইট সন্ধ্যা সাতটায়। লন্ড থেকে শাড়িখানা টানটান ইপ্তি হয়ে এলো। হঠাৎ খেয়াল হলো আরে! আরে! শাড়ির সঙ্গে তো পেটিকোট প্রয়োজন। তা তো কেনা হয়নি!

আমার স্বামী অস্থির হয়ে উঠলেন। প্রস্তাব দিলাম পেটিকোট ছাড়াই পরি। রবীন্দ্রনাথের দাদা সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী কর্তৃক প্রচলনের আগে মেয়েরা তো পেটিকোট, ব্লাউজ ছাড়াই শাড়ি পরতো। তিনি তো শাড়ির সঙ্গে ও দুটো যোগ করায় প্রথম প্রথম সাহেবিপনা বলে বেশ সমালোচিত হয়েছিলেন।

আমার স্বামী একটি মোটর সাইকেল ধার করে ছুটলেন পেটিকোটের সন্ধানে। সন্ধ্যা ছয়টায় ফিরে এলেন পেটিকোট নিয়ে। প্যাকেট খুলে যা দেখলাম তা অমূল্য ধন পেটিকোটখানার রঙ একদম সিগনাল বাতির মতো সবুজ। যেখানে আমার শাড়িখানা হলো হালকা ছাই রঙ-এর। রঙ সম্পর্কে আমার স্বামীর এ জ্ঞানের আর কোনো তুলনা মেলে না। ঠিক এভাবেই আমাকে অবাক করে দিয়ে সে একবার লাল টকটকে সিগনাল বাতিতে গাড়ি ছুটিয়ে গিয়েছিলেন। তাও আবার ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের মিলিটারি পুলিশের চোখের ওপর দিয়ে। পরবর্তী ভাগ্যকথা আজ এখানে ঠাই পাবে না। যাই হোক। চোখ ঠিকরে প্যাকেটের ফাকে উকি দেয়া সিগনাল বাতিটি দেখতে লাগলাম।

পেটিকোট ম্যাচ হয়নি তো কি হয়েছে! ট্রাউজার্সের ওপর শাড়ি পরলে কি হয়! পার্থক্য তো মাত্র ট্রাউজার্সের পা দুখানা আলাদা করা আর পেটিকোটে কোনো ভাগাভাগি নেই। দিব্যি ট্রাউজার্সে গুজে

শাড়ি পরে নিলাম। কিন্তু এ কি! শাড়িটায় ঠকলাম নাকি! আমার উচ্চতা এমন কিছু নয়, বরং সর্বক্ষণ আমি হিল জুতা দিয়ে নিজের খর্বাকৃতি গোপন করি। কিন্তু এ শাড়িখানা যে আমার খালি পা-ই ঢাকতে পারছে না। এভাবে কি যাওয়া সম্ভব! সেখানে সমবেত হবেন রূপবতী, সুব্ৰহ্মচন্দ্রসম্পন্ন মিসেসরা। তাদের শাড়ির ভাজে ভাজে ফুটে থাকবে তাদের বিলাসী জীবনের অফুরন্ত সময়ের কাহিনী। আমি কোথাকার এক সাতটা দুটা অফিস করা ক্লান্ত পথিক!

সেই রাতে আমি আর আমার স্বামী হাত ধরাধরি করে অন্ধকার রাস্তায় হেটে হেটে জোনাকি পোকা দেখেছি। জোনাকি পোকারা এতো সৌন্দর্য উপহার দিতে পারে!

বারডেম হাসপাতাল, ঢাকা থেকে

তেরো প্যাচ

— কাজল

দেখি তুমি প্র্যাকটিকালে পাস নাশ্বারের ওপর বেশি নাশ্বার কিভাবে পাও। এতোটুকু বয়সেই খুব পাকা কথা শিখে ফেলেছো। পড়ালেখার বেলায় ঘোড়ার আগু আর কথা বলার বেলায় খুবই পাকা। কঠিন গলায় বললেন বোটানির বীথিম্যাডাম।

বিএসসি পাস কোর্সে পরীক্ষা দিয়েছি। বাকি রয়েছে প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা। পরীক্ষার ডেট পড়েছে শুনে দেখা করতে গেলাম বীথিআপার রুমে। রুমে অন্য ডিপার্টমেন্টের একজন স্যার ও আমাদের বোটানির স্বপ্নাম্যাডাম বসে রয়েছেন।

আমাকে দেখেই আপা বললেন, তোমাদের পরীক্ষার ডেট পড়েছে। নোটিশ বোর্ডে রোল, গ্রুপ ও তারিখ অনুযায়ী পরীক্ষা হবে।

বললাম, জি ম্যাডাম পেয়েছি। একটু সাহস করেই বলে ফেললাম, ম্যাডাম, আমাদের এক্সটার্নাল কোন জায়গা থেকে আসবেন?

ম্যাডাম বললেন, নরসিংদীর এক কলেজ থেকে এক ম্যাডাম আসবেন।

ম্যাডাম-এর কথা শুনে হঠাৎ করে বলেই ফেললাম, তাহলে তো সর্বনাশ!

বীথিম্যাডাম বললেন, কিসের সর্বনাশ?

ম্যাডাম, মহিলাদের মনে তেরো রকমের প্যাচ।

অবাক হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তেরো রকমের প্যাচের মানে কি?

বললাম, মহিলারা শাড়ি পরে বারো হাতের আর তাদের মনে থাকে তেরো রকমের প্যাচ অর্থাৎ শাড়ির চেয়ে একহাত বেশি। ম্যাডাম ঠিকঠাক মতো নাশ্বার দেবেন কি?

কিভাবে যে সাহস করে কথাগুলো বলে ফেললাম তা নিজের কাছেই স্বাভাবিক মনে হলো না।

বীথিআপা শুনে রাগতভাবে বললেন, দেখো, আমিও একজন মহিলা, তুমি মহিলাদের অপমান করেছে। তুমি এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও রুম থেকে।

নির্দিষ্ট তারিখে সকাল নয়টায় কলেজে গেলাম পরীক্ষা দিতে।

পরীক্ষার মাঝখানেই রোল অনুযায়ী ডাক পড়লো মৌখিকের জন্য ম্যাডামের রুমে।
আমাকে দেখেই বীথিম্যাডাম এক্সটার্নাল ম্যাডামের সামনেই বলে ফেললেন, কি বারো হাত?
এক্সটার্নাল তো এ কথা শুনে অবাক, আমার সামনেই ম্যাডামকে সব খুলে বললেন বীথিম্যাডাম।
ম্যাডাম কথা শুনে হাসতে হাসতে আমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন।
আমিও তার সঠিক উত্তর দিলাম।
রুম থেকে বের হওয়ার সময় ম্যাডাম শুধু এটুকুই বললেন, দশ নাশ্বারের মধ্যে তুমি কতো নাশ্বার
পেলে খুশি?
আমি সরাসরি বললাম যে, আপনি যা নাশ্বার দেবেন তাতেই ম্যাডাম আমি খুশি। বলে বের হয়ে
এলাম।
পরে বীথিম্যাডামের কাছ থেকে জেনেছিলাম যে, দশ নাশ্বারের মধ্যে আমি আট নাশ্বার পেয়েছি।

সেহড়া, ময়মনসিংহ থেকে

হঠাৎ

– শিশির মাহমুদ খান

সদ্য পাস করা যুবকের পক্ষে হঠাৎ বিয়ে করা আর আকাশ ভেঙে পড়া সমান কথা। টিউটর হিসেবে
বেশ সুনাম কুড়িয়েছিলাম। ক্যান্টনমেন্টে পড়াতাম। ছাত্রীও বেশ ভালো ছিল। তার খুবই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি
ছিল। আমি প্রায়ই তার কাছে হার মানতাম। স্কুলের নাইন-টেন ক্লাসের সবগুলো বিষয়েই দক্ষতা
সমান ছিল। বায়োলজির ছাত্র ছিলাম বলে কম সম্মানীতে পড়াতাম। শাপলার বাবা ছিলেন খুব
ভালো মানুষ, ভদ্র, শান্ত লোক। লেখাপড়ার খোজ নিতেন মাঝে মধ্যে। যদিও সংসার চালাতেন তার
মা। তার মা যথেষ্ট রাগী ছিলেন। তার কথার অবাধ্য হওয়ার কোনো উপায় ছিল না।
বেশি শাসনে যা হয়। আমার ছাত্রীও বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল। একদিন না পড়াতে গেলে পরের দিন
আমার কৈফিয়ত দিতে হতো কড়ায় গণ্ডায়। কথা দিতে হতো আর তুল না করার জন্য। এমনি
পরিস্থিতিতে ধীরে ধীরে ভালোবেসে ফেলি চঞ্চল এই মেয়েটিকে। তার সরলতাতেও মুগ্ধ হতাম।
একদিন সাহস করে লিখে জানালাম। সে রাজি হয়ে গেল। কিন্তু পরীক্ষা দিতে হবে আমাকে।
কোয়ার্টারে মাঝের রুমে আমরা। অজানা, দুর্ভাগ্য, দুর্বোধ্য আবেগে উভয়েই কাছাকাছি। তার চিবুক
আমার হাতে। ধীরে ধীরে আমার ঠোট দুটো এগোচ্ছে অজানা তৃষ্ণায়। সে নিশুপ। ভাবতেই পারিনি
তার মা এই সময় আসবেন। সাধারণত বিকেলে তা মা শুয়ে থাকে বা হাতের কাজ করেন। এবং
পড়ানোর সময় কখনো আসেন না।
ধরা পড়ে গেলাম। তার মায়ের হুংকারে দিশেহারা। উভয়েই মাথা নিচু করে চুপচাপ আছি। রাগে,
ক্রোধান্বিত হয়ে তার মা যা করলেন তা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। শুধু একটি কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন,
অনার্স হয়েছে কি না!

হ্যা উত্তরেই অনেক স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল। মানুষ যে স্বাভাবিক স্বপ্ন দেখে তা আর হলো না। কিভাবে কেমন করে লোকজন দুই একজন করে আট দশজন হয়ে গেল। রাতেই কাজি ডেকে দুজনকে একসূত্রে বেধে দিলেন। মুরগিদের মাঝে একজন শুধু একবার বললেন, শাপলাকে তুমি পছন্দ করো না?

নীরব সম্মতিতে এক লাখ টাকা দেনমোহরে বিয়ে করলাম। উপায় ছিল না। এভাবে জোর করে বিয়ে দেবে তা চাইনি। দুজনকে দুই রুমে থাকতে দেয়া হলো। আমার মনের মাঝে শত সহস্র দ্বিধা, ভয়, হতাশা, সম্পূর্ণ নির্বাক আমি।

পরের দিন একটা শাড়ি পরিয়ে শাপলাকে বললেন, এবার তোমার স্বামীর ঘরে যাও। আমাকে একটা খাম ধরিয়ে দিয়ে বললেন, আর আসতে হবে না। তাকে নিয়ে কোথায় উঠবে, কি করবে এ তোমার ব্যাপার। আমি চাই না তোমরা এক মুহূর্ত এ বাড়িতে থাকো।

চোখে সর্ষে ফুল দেখতে দেখতে বের হলাম। শাপলার বাবা কোর্সে ছিলেন। তিনি থাকলে হয়তো এ পরিস্থিতি হতো না। ঘটনাটি ১৯৯৮ সালের। তারপর অনেক সংগ্রাম, ধিক্কার, অপমান, হতাশা পেরিয়ে গেছে। জীবনকে বুঝতে শিখেছি। মহান সৃষ্টিকর্তা বেশ সুখে রেখেছেন। শাপলার বাবা মাঝে মধ্যে দেখতে আসেন।

আমি অনেক দিন জানতে চেয়েছি যে তার মায়ের এমন আচরণ করার কারণ কি? অতঃপর তার বাবার মুখে সত্য ঘটনাটি শুনলাম। মাতৃহীন প্রেয়সীকে আর অনুরোধ, আদেশ করি না। কেননা লাভ নেই। সেই যে শাড়ি পরিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল তার মা, এরপর থেকে সে আর শাড়ি পরে না। সালায়ার-কামিজ, ম্যাক্সি এসবই তার পোশাক। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও যখন তাকে রাজি করাতে পারি না তখন আশা ছেড়ে দিয়েছি। ভাবছি শাড়ি সংখ্যাটি পেয়ে যদি তার মনে একটু উৎসাহ হয়। কারণ তার মতো হয়তো অনেকে আছে যাদেরও শাড়ি নিয়ে দুঃখ কম নয়।

রাজ্যমাটি, সাভার থেকে

কারণ...

– হিজল

ছোটবোন এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে আনা-নেয়ার তার আমার ওপরই পড়লো। কেন্দ্র আমিন বাজারের মফিদ-ই-আম স্কুল। তো প্রথম দিনই তাকে গেটের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে গেটের সামনে দাড়িয়ে আছি। হঠাৎ সিগারেট সমান দূরত্বে একটি ত্রিচক্রযান এসে থামলো। চোখ পড়লো সিটে। হৃদয় ব্যারিকেডে হোচট খেলাম। ছিমছাম একটি ছেলের সঙ্গে অনিন্দ সুন্দরী দুটি মেয়ে। হোয়াইট প্লাস টুথ পেস্টের মতো তাদের গায়ের রঙ, স্নিম দীঘল শরীর।

ছোট মেয়েটি পরীক্ষার্থী। অন্য দুইজন অভিভাবক। বড় মেয়েটি হালকা গোলাপি শাড়ি পরেছে। অপরাধ লাগছে তাকে। আন্দাজ করা যায়, বিয়ে ঠিক হয়ে আছে নতুবা অচিরেই বিয়ে হচ্ছে এমন। শাড়ি পরার রিহাসাল দিচ্ছে। আষ্টেপৃষ্ঠে তার বুকো কামড়ে ধরা ব্লাউজ আর তলপেটের ফর্শা অংশ

যেন সৌন্দর্যের দ্যুতি ছড়াচ্ছে। রিকশা থেকে নেমেই তারা হন হন করে গেটের কাছে চলে গেল পারফিউমের গন্ধ ছড়িয়ে।

বাসায় ফিরে সেদিন রাতে ঘুমাতে পারলাম না। বার বার শুধু সেই মেয়ে দুটোর কথা মনে হতে লাগলো। বিশেষ করে বড় মেয়েটির সেই আকর্ষণীয় বুক ও তলপেটের ফর্সা অংশ। চিন্তা করতে লাগলাম কি করা যায়। এক পর্যায়ে মন স্থির করলাম। দুটি মেয়েই যেহেতু সুন্দরী সেহেতু বড়টি সম্ভব না হলেও ছোট মেয়েটিকেই আমাদের বাড়িতে আনতে হবে। না মানে ঠিক আমার জন্য নয়। আমার এক বড়ভাইকে বিয়ে করানোর জন্য অনেক দিন ধরেই এমন একটি সুন্দরী মেয়ে খুজছিলাম। তিনি ভালো সরকারি চাকরি করেন। যদিও মনে মনে প্রচণ্ড হিংসা হচ্ছিল এই ভেবে যে, এমন একটি সুন্দরী মেয়েটিকে ভাইয়াকে দিয়ে দিতে হবে! সান্ত্বনা পেলাম, চমৎকার সুন্দরী একটি বেয়াইন তো পাচ্ছি! তাছাড়া কথায় আছে, ভাবী, নাভি পর্যন্ত দাবি।

কেন্দ্রে অভিভাবকদের তেমন বসার জায়গা ছিল না। স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি কফিল সাহেব এ ব্যাপারটি চিন্তা করে মসজিদ মার্কেটের ফাকা জায়গায় অভিভাবকদের বসার ব্যবস্থা করেছেন। শুধু তাই নয়, প্রায় প্রতিদিন অভিভাবকদের চা বিস্কুট খাওয়ান মাগনা-মাগনা।

তৃতীয় দিন লক্ষ্য করলাম, ছেলেটির দেখা নেই। চতুর্থ পঞ্চম দিনেও একই অবস্থা। শুধু শাড়ি পরা বড় মেয়েটিই পরীক্ষার্থী মেয়েটিকে নিয়ে আসে এবং চুপচাপ আমার মতো চেয়ারে বসে থাকে। উল্লেখ্য, আমি বরাবরই একটু ইয়ে... মানে লাজুক টাইপের। মেয়েদের সঙ্গে সহজে কথা বলতে পারি না। এ জন্য বন্ধুরাসহ পাড়ার সকল নায়িকারা তো আমাকে লাজের বাদশা নামে ডেকে ডেকে একেবারে হয়রান।

যাহোক, সিদ্ধান্ত নিলাম আগামীকালই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলবো এবং বাকি দিনগুলোতে ফ্র হয়ে এক পর্যায়ে সুযোগ বুঝে ঠিকানাটা নিয়ে নেবো। ভিত্তি আর কাকে বলে রে ভাই! দীর্ঘ তিন ঘণ্টা আশপাশেই বসে রইলাম। ঘোরাঘুরি করলাম। কিন্তু একটি কথাও বলতে পারলাম না। অবশ্য একশ আশি মিনিটে প্রায় আশিবারের মতো শাড়ির নিচ দিয়ে চুরি করে তার বুক আর তলপেটের সৌন্দর্য দেখেছি। প্রচণ্ড শিহরণে মাঝে মাঝে ইচ্ছা করতো একটু স্পর্শ করি, নাভিমূলের ওই গর্তে ডুবে মরি।

এভাবে ছয় দিন কেটে গেল। তার মধ্যে তিন দিনে তিন ঘণ্টা করে মোট পাচশ চল্লিশ মিনিটে প্রায় দুইশ চল্লিশ বারের মতো আমার এই অবাধ্য লাজুক চোখ দুটোর দৃষ্টি আক্রমণ করলো সেই মেদহীন ফর্সা মসৃণ উদ্যানে। বাকি তিন দিন সালায়ার-কামিজ আমার সঙ্গে বিট্টে করলো।

খিওরি পরীক্ষার সপ্তম দিন। আজ থেকেই কথা বলা প্রয়োজন। না হলে পস্তাতে হবে। মনের সমস্ত লাজুকতা আর ইতস্তত ভাব ঝেড়ে ফেলে অবশেষে কথা বলার প্রাথমিক পর্যায়ে শুরু করলাম।

আপনার কে পরীক্ষা দিচ্ছে?

আমার ছোটবোন।

কোন স্কুল থেকে?

চাকুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে।

আপনার? প্রশ্ন করলো আমাকে।

বললাম, আমারও ছোটবোন।
হাসি দিয়ে বললাম, প্লিজ, আপনার নামটা যেন কি?
তৎক্ষণাৎ উত্তর, আমার নাম তুলসী রানী সাহা।
হঠাৎ হাতুড়ি পেটার শব্দে আমার ভেতরটা দ্রিম করে উঠলো।
কারণ...

দক্ষিণ শ্যামপুর, সাভার থেকে

অন্য আমি

– লাবণ্য

শাড়ি ও নারী কথা দুটো যেন জড়িয়ে আছে একে অপরকে। একটি শাড়িই পারে একজন নারীকে অপরাধী করে তুলতে। নারী হিসেবে আমারও তাই শাড়ির প্রতি প্রচণ্ড দুর্বলতা রয়েছে ছোটবেলা থেকেই। প্রায়ই মায়ের ঘরে পরার কাপড়গুলোর পরতাম। বিশেষ করে মা যখন বাইরে যেতেন তখনই গুরু হতো আমার শাড়ি পরার পালা। মায়ের শাড়ি ও স্যানডাল পরে ঘরময় ঘুরে বেড়াতাম। আমাদের একটা কাঠের আলমারি ছিল। তার একদিকের একটি তাকে বেশ কিছু শাড়ি ছিল যা মায়ের ফুপা লন্ডন থেকে পাঠিয়েছিলেন। আমার সেই নানা মারা যাওয়ায় মা শাড়িগুলো যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন, কখনো পরতেও দেখিনি। মাঝে মধ্যে মা যখন শাড়িগুলো রোদে দেয়ার জন্য বের করতেন তখন সেগুলো পরে ঘুরে বেড়াতাম এঘর থেকে ওঘর।

একদিনের ঘটনা। মা শাড়িগুলো বের করলেন রোদে দেয়ার জন্য। একটা একটা শাড়ি যখন নামাচ্ছিলেন তখন তার ভেতর থেকে টুকরো টুকরো কাপড় পড়তে লাগলো। তখন মা তাড়াতাড়ি করে সবগুলো শাড়িই নামালেন। নামিয়ে দেখলেন শাড়িতে কয়েকটা ইদুরের বাচ্চা এবং প্রতিটি শাড়িতেই অনেকগুলো করে ফুটো। আলমারিটা খুঁজে আলমারির পেছনে একটা ফুটো আবিষ্কার করা হলো। অর্থাৎ কাঠের আলমারিটা ইদুর কেটে তার ভেতরে ঢুকে মায়ের শাড়িগুলোকে বাচ্চা প্রসব করার উপযুক্ত জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছে।

সেদিন মা যতোটুকু না কষ্ট পেয়েছিলেন তার চেয়ে আরো বেশি কষ্ট পেয়েছিলাম আমি। কারণ মায়ের সুন্দর শাড়িগুলো পরতে পারবো না। এদিকে নতুন বড় একটা স্টিলের আলমারি বানানো হলো। কিন্তু মা স্মৃতি হিসেবে যেসব শাড়ি রেখেছিলেন সেগুলো আর ঠিক করা যাবে না। এরপর মায়ের শাড়ি কেনাও কমে গেল। মা যখনই কোনো নতুন শাড়ি কিনতেন সেটা আমিই প্রথমে পরে উদ্বোধন করতাম।

আমার এ অভ্যাসটা এখনো রয়ে গেছে। এখন অবশ্য শাড়ি পরে মাঝে মধ্যে বাইরে যাই। প্রতিবারেই বাসায় ফিরি শাড়িতে একটা ফুটো নিয়ে। প্রথম প্রথম অবশ্য বকা শুনতে হতো। এখন মা কিছু বলেন না। ফিরলে শুধু জিজ্ঞাসা করেন, কয় জায়গা ছিড়েছে? ব্যাস এটুকুই। আর কিছু বলেন না।

একবার শাড়ি নিয়ে একটা মজার ঘটনা ঘটেছে। আমাদের স্কুলে পিকনিক হবে। আমি তখন ক্লাস এইটে পড়ি। আমাদের স্কুলটা ছিল গার্লস স্কুল আর পিকনিক হবে স্কুলের ভেতরেই। তাই সব

বান্ধবীরা মিলে প্ল্যান করলাম পিকনিকে শাড়ি পরবো। কথাটা অবশ্য আমার মুখ থেকেই প্রথম বের হলো। এদিকে একজন বান্ধবী শাড়ি পরতে রাজি না। তাকে অনেক কষ্টে রাজি করলাম। এবার সবাই রাজি। কিন্তু সমস্যা একটা রয়ে গেল আর সেটা আমাকে নিয়ে। আমি সব সময় শাড়ি পরেছি ঘরের ভেতর। সেটা ঘরে পরার জামার ওপরই পরেছি। কখনো ব্লাউজ, পেটিকোট দিয়ে শাড়ি পরিনি। তাই পিকনিকে কিভাবে শাড়ি পরবো তাই নিয়ে সমস্যা হলো। তারপর বাসায় গিয়ে গুরু হলো প্র্যাকটিস। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম। হার মানতে হলো লজ্জার কাছে। কারণ বাসা থেকে স্কুল অনেক দূরে। তার ওপর বেশ কিছুটা পথ হেটে রিকশা নিতে হয়। সেই পথটুকু ওইভাবে গেলে লোকজন তাকিয়ে থাকবে। সেই চিন্তায় তখন আমার রাতের ঘুম হারাম।

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলাম সালায়ার কামিজের ওপরই শাড়ি পরবো। পিকনিক হলো আর আমিও পিকনিকে সালায়ার কামিজের ওপর শাড়ি পরে স্কুলে উপস্থিত হলাম। ভেবেছিলাম গার্লস স্কুল। তাই কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু একি! সবাই দেখি আমার দিকে বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে এবং মিটিমিটি হাসছে। আমার বান্ধবীরা যখন স্কুলে এসে আমার এ অবস্থা দেখলো তখন তারা হেসেই খুন।

যাহোক, কোনোভাবে পিকনিক সেরে বাসায় ফিরলাম। একদিন পর স্কুলে গেলাম। গিয়ে দেখি সেদিনও একই অবস্থা। সবাই কেমন করে যেন তাকায় আর মিটিমিটি হাসে। আবার কেউ কেউ আঙুল তুলে আমাকে দেখিয়ে পাশের জনকে কি যেন বলে। বাধ্য হয়ে মাঠ থেকে উঠে ক্লাসে গিয়ে বসলাম।

সেখানেও একই অবস্থা। এ অবস্থা দেখে কিছুদিন স্কুলে যাইনি। ভেবেছিলাম সবাই হয়তো ব্যাপারটা এতোদিনে ভুলে গেছে। কিন্তু না। কেউ কিছু ভোলেনি।

আমি মোটামুটি পপুলার হয়ে উঠলাম। ছোট ক্লাস, বড় ক্লাস সব মেয়েরাই আমাকে চেনে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, আমাকে নিয়ে এ হাসাহাসি আমি থামাবোই।

কিন্তু কোনো সুযোগ পাচ্ছিলাম না। তাই আবার এক বছর অপেক্ষার পালা। এরপর আবার ক্লাস নাইনের পিকনিক। সেই পিকনিকে শোধ নেয়ার জন্য সমস্ত লাজলজ্জা ভুলে ব্লাউজ পেটিকোট দিয়ে শাড়ি পরে উপস্থিত হলাম। সঙ্গে একটু সাজগোজও ছিল।

এবার সবাই আমার দিকে তাকালো। তবে তাচ্ছিল্য বা মজা করার ভঙ্গিতে নয়। এবার তাকালো প্রশংসার দৃষ্টিতে। যারই সঙ্গে দেখা হচ্ছে সবাই বলছে, খুবই সুন্দর লাগছে আজ তোমাকে। ক্লাস টেনের একজন আপু তো তার ভাইয়ের জন্য আমাকে পছন্দ করে ফেললেন। সেদিনের সবার প্রশংসায় ভুলে গেলাম অতীতের সমস্ত ঘটনা, গুরু হলো নতুন পথ চলা।

মিরপুর থেকে

জাল ভিসা

– কামাল

একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত যৌথ পরিবারের বড় ছেলে রহিম। বাড়ি চাদপুরের সূচিপাড়ায়। রহিমের মায়ের খুব শখ একটা বিদেশি লাল শাড়ি পরার। এ ধরনের শাড়ি সে পাশের বাড়ির শিফনের মায়ের পরনে প্রায়ই দেখে। অবশ্য তার বৌয়ের গোলাপি ও হালকা বাদামি রঙের শাড়ি বেশ পছন্দ।

এদিকে মায়ের এতোই শখ যে, মনে হয় শাড়িটা পেলে জীবনের সমস্ত সুখ আর আনন্দ পেয়ে যাবে। তারা স্বপ্ন দেখে রহিম বিদেশ গিয়ে তাদের সেই শখের শাড়ি নিয়ে আসছে। তারা উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে কবে সে বিদেশ যাবে। রহিমও তাদের আশ্বাস দেয় এবং স্বপ্ন দেখে একদিন লাগেজ ভর্তি করে মা, বৌ এবং বাবা আর ভাই-বোনের জন্য অনেক কিছু নিয়ে আসবে।

অবশেষে এক আদম ব্যাপারীর মাধ্যমে রহিম মাঠ ও বাড়ির কিছু জায়গা বিক্রি করে এবং মাঠের অবশিষ্ট জায়গা চল্লিশ হাজার টাকার বিনিময়ে বন্ধক রেখে সউদি আরবের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়। মা-বাবা বেশ খুশি। তারা ভাবলেন, তাদের এতোদিনের দুঃখ-কষ্টের অবসান হতে যাচ্ছে।

কিন্তু হায়! *কপালের লিখন, না যায় খণ্ডন।* রহিম গেল তিন মাস হয়েছে। অথচ টাকা পয়সা তো দূরের কথা, তার কোনো খোজ-খবরই নেই। পরিবারের সবাই খুব চিন্তিত। এদিকে যার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছে সে জমি রেজিস্ট্রি করে দেয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। কয়েকদিন পর লোক মারফত তারা রহিমের একটা ক্যাসেট পেল। ক্যাসেট শুনে তো কান্না-কাটি আরম্ভ। তাকে জাল (অবৈধ) ভিসায় পাঠানো হয়েছে।

পালিয়ে পালিয়ে থাকছে আর মাঝে মধ্যে খুবই সতর্কতার সঙ্গে কিছু কাজ করছে। এতে যে বেতন পাচ্ছে তাতে তার নিজের চলাটাই কষ্টকর, বাড়িতে আর কি দেবে। যে কোনো সময় ধরা পড়তে পারে। এবং ধরা পড়লে জেল খেটে সোজা দেশে চলে আসতে হবে।

পরিবারের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। জমিটা পাওনাদারকে রেজিস্ট্রি করে দিতে হয়েছে। অবশেষে সাড়ে চার মাস পর রহিম বাড়িতে চলে আসে। চেহারা কুণ্ণসিত হয়ে গেছে। গায়ে দাগ, চুল বেশ ছোট আর চামড়া কালো হয়ে গেছে। ছেলে বিদেশ থেকে এলেও মায়ের মুখে হাসির পরিবর্তে চোখ দিয়ে পানি ঝরছে। উদগ্রীব হয়ে শাড়ির কথা জিজ্ঞাসা না করে শুধু কাদছে। অবশ্য রহিম তার মায়ের সেই স্বপ্ন, সেই শখের কথা ভোলেনি। মায়ের জন্য সে লাল শাড়ি এনেছে।

যেখানে তার এ শাড়ি পরে বেড়ানোর কথা সেখানে সে এর দিকে তাকাচ্ছেও না। মনে হচ্ছে এটাই যেন তার জন্য কাল হয়ে গেছে।... বোন ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়ে আর পড়ছে না। ছোট বোন ক্লাস ফাইভে পড়ে। ছোট ভাই আছে। সামনে কিভাবে চলবে তারা? মা-বাবা, রহিম কারোরই চিন্তায় ঘুম আসছে না।

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

পরকীয়া

- এ.এস.এম. রহমাতুল্লাহ

আমি তখন খুলনা বিএল কলেজের ছাত্র। সেই সুবাদে খুলনায় থাকতাম। আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে ছিলেন রুম্মাভাবী নামের এক ভদ্রমহিলা। রুম্মাভাবী ছিলেন দারুণ সুন্দরী। পাড়ার সকল ছেলে রুম্মাভাবী নামে অজ্ঞান। তিনি আমার পাশের ফ্ল্যাটে থাকলেও ওনার সঙ্গে আমার কোনো কথা হতো না। আমি ছিলাম একটু লাজুক টাইপের। কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে খুব লজ্জা লাগতো।

আমার পরীক্ষা সামনে। তাই এক সন্ধ্যায় খুলনা নিউ মার্কেটে গেলাম একটা শার্ট কেনার জন্য। এক দোকানে শার্ট দেখছি এমন সময় এক মহিলা কণ্ঠ আমার নাম ধরে ডাক দিল। পেছন ফিরতেই দেখি রুম্মাভাবী। খুবই অবাক হলাম এবং বললাম, আমার নাম জানলেন কিভাবে?

তিনি বললেন, প্রতিবেশীর নাম জানবো না তা কি হয়? এ কথা বলেই আমার হাত ধরে বললেন, চলো আমি একটি শাড়ি কিনবো পছন্দ করতে পারছি না। তুমি একটি শাড়ি পছন্দ করে দাও।

তার আচরণে খুবই অবাক হলাম! যার সঙ্গে কখনো আমার কথা হয় না তিনি এ রকম আচরণ করছেন কেন? তিন চার দোকান ঘোরার পরে একটি দোকান থেকে নীল রঙের একটি শাড়ি পছন্দ করে দিলাম। আমার পছন্দ দেখে তিনি খুব প্রশংসা করলেন।

বাসায় ফিরে এলাম। সেদিন রাতে আমার একদম ঘুম হলো না। শুধু ভাবছিলাম একজন সুন্দরী নারী আমার প্রশংসা করেছেন। নিজেই খুব গর্বিত মনে হচ্ছিল তখন।

পরের দিন দুপুরে তার কাজের বুয়া এসে জানালো ভাবী আপনাকে যেতে বলেছেন। কিছুক্ষণ পরে গেলাম রুম্মাভাবীর বাসায়। ঢুকতেই দেখি ভাবী বসে পেপার পড়ছেন।

আমাকে দেখে একটা মুচকি হাসি দিয়ে বসতে বললেন। আমি সুবোধ বালকের মতো বসে পড়লাম। হঠাৎ ভাবী বললেন, আচ্ছা তুমি এমন কেন বলো তো? এ যুগে কোনো পুরুষ কি এতো লাজুক থাকে। পুরুষ থাকবে পুরুষের মতো।

জানতে চাইলাম কেন আসতে বলেছেন।

উত্তরে তিনি বললেন, কাল শাড়ি কিনে দিলে, দেখবে না শাড়িতে কেমন মানিয়েছে। তুমি এখানে বসো আমি শাড়িটা পরে আসি। বলেই তিনি ভেতরে চলে গেলেন।

পেপারটা দেখছিলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে পেপারটা নামাতেই দেখি আমার একেবারে সামনে এসে নীল শাড়ি পরে দাড়িয়ে আছেন রুম্মাভাবী।

নীল শাড়িতে ভাবীকে খুব সুন্দরী মনে হচ্ছিল। সুন্দরী কথাটা মনে উঠতেই বুকের মধ্যে ছোট একটা মোচড় অনুভব করলাম। হ্যা, তাই তো, আমার সামনে দাড়িয়ে থাকা এই নারীটি শুধু সুন্দরীই নয়, আরো কিছু, আরো অনেক বেশি সুন্দরী।

পলকহীন একভাবে শুধু তাকিয়েই আছি তার দিকে। সে যেন এক রূপকথার নায়িকা। রূপকথার গল্পের পাতা থেকে উঠে এসে এই মাত্র যেন আমার সামনে দাড়িয়েছে। নীল শাড়ি পরা চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। চশমার ও পাশে গভীর দুটি আত্মগুণ চোখ। দুটি জলে ডোবা সুন্দর চোখ

দেখে ভাবি জীবনানন্দের পাখির নীড়ের উপমা যেন কেবল এ দুটি চোখেরই জন্য। পলকহীনভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে ভাবী বলে উঠলেন, এই, এভাবে তাকিয়ে আছ কেন? মনে হচ্ছে খেয়ে ফেলবে?

বললাম, নীল শাড়িতে আপনাকে খুব সুন্দর লাগছে একদম চোখ ফেরানো যাচ্ছে না। সত্যিই আপনি খুব সুন্দরী, দারুণ সুন্দরী।

ভাবী বললেন, তুমিও খুব সুন্দর। প্রথম যেদিন তোমাকে দেখেছি সেদিনই তোমাকে আমার ভালো লেগেছিল। কিন্তু তুমি খুব লাজুক। তাই শুধু দূরে দূরে থাকো। আমি যে তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি।

বললাম, আপনার তো সংসার আছে! আমাকে ভালোবাসবেন কি করে?

ভালোবাসা কি শুধু সংসারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? বলেই ভাবী দুহাত দিয়ে আমার মাথাটা চেপে ধরে আমার ঠোটে চুমু খেলেন।

তখন আমার যে কি আনন্দ লাগছিল তা বোঝাতে পারবো না। যা কখনো ভাবিনি তাই ঘটলো আমার জীবনে। এমন সুন্দরী নারীর পরশ পেতে কার না ভালো লাগে! আমিও ভাবীকে এলোপাতাড়িভাবে চুমু খেতে লাগলাম। এক পর্যায়ে তাকে সোফায় শুইয়ে শাড়ি, ব্লাউজ, ব্রা, পেটিকোট সব খুলে সম্পূর্ণ নগ্ন করলাম। দুচোখ ভরে দেখছিলাম ভাবীর সৌন্দর্য।

ভাবী আমাকে প্রচণ্ডভাবে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি আর সহ্য করতে পারছিলেন না। আমরা দুজনে হারিয়ে গেলাম সুখের সাগরে! যেখানে শুধু আনন্দ ও আনন্দ। অসীম আনন্দের মাঝে বিচরণ করে এক পর্যায়ে দুজনেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তারপর ভাবী আমার সর্বাঙ্গে চুমু খেতে লাগলেন। বললেন, তুমি আমাকে যে তৃপ্তি দিয়েছো তা জীবনে কখনো পাইনি।

এরপর থেকে চলতে লাগলো ভাবী আর আমার পরকীয়া প্রেম।

একদিন রাতে ভাবী আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমার এমন একটি স্মৃতি আমি ধরে রেখেছি যা সারা জীবন তোমার কথা মনে করিয়ে দেবে। আমার গর্ভে তোমার সন্তান। যার বয়স ছয় মাস হতে চলছে।

আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। বললাম, যদি কলেঙ্কারি হয়ে যায়!

ভাবী আমাকে ছোট একটি কামড় দিয়ে বললেন, কোনো চিন্তা করবে না। একমাত্র মা-ই জানে তার সন্তানের পিতা কে। তাই কেউ কিছু মনে করতে পারবে না।

কিছুদিন পরে একটি ছেলে সন্তান জন্ম নিল।

আজো রুম্মাভাবী আমাকে এবং আমি রুম্মাভাবীকে ভুলতে পারিনি।

বোয়ালমারি, ফরিদপুর থেকে

বকেয়া কান্না

– মীর আবদুর রউফ

১৯৭৫ সালের শীতকাল। ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষের কালো খাবা গ্রাস করেছে আমার চার ভাই আর মা-বাবার সংসারের সব। তাই ১৯৭৫ সালেও অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব আর বাসস্থানের অভাব নিকষ কালো ছায়া ফেলে রেখেছিল আমার পরিবারের ওপর। আমি তখন ক্লাস সিক্সের ছাত্র। দারুণ অর্থাভাবে চার ভাইয়ের লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম। ছেলেদের বস্ত্রাভাব তাও কিছুটা সহনীয়। কিন্তু মেয়েদের বেলায় তা একেবারে অসহনীয়। এই অসহনীয়তার যে কি জ্বালা তা একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কারো জানার কথা নয়।

আমার দুঃখী মায়ের বস্ত্রাভাব দেখে আমার এক ফুপাতো ইঞ্জিনিয়ার ভাইয়ের স্ত্রী তার দুটো শাড়ি দিয়েছিলেন মায়ের লজ্জা নিবারণের জন্য যা সে সময় মায়ের জন্য ছিল খোদাতায়ালায় আশীর্বাদ।

এক শীতের সকালে ঘরে খাবার কিছু নেই। তাই মায়ের একটা শাড়ি ভাজ করে চাদরের মতো গায়ে দিয়ে ইতস্তত ঘোরাফেরা করছি। হঠাৎ প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে এক প্রস্তাব পেলাম কুড়াল দিয়ে তাদের খড়ি কেটে দিতে হবে। খাবার আশায় তাই শুরু করে দিলাম কাজ। কারণ কাজের পরেই খাবার যা ক্ষুধার্ত শরীরের একমাত্র ধ্যান।

খুব মন দিয়ে কুড়ালের সাহায্যে খড়ি কাটছি। গায়ে মায়ের শাড়ি। এ অবস্থাতেই ঘটলো বিপত্তি। হঠাৎ কুড়াল গিয়ে কাঠে লাগার আগেই শরীর থেকে শাড়ির এক অংশ গিয়ে পড়লো কাঠের ওপর। তার উপরে কুড়ালের কোপ। ব্যাস, ভাজ করা শাড়ি চার পরতে কেটে গেল। যতোটা না দুঃখ পেলাম তার চেয়ে বেশি ভীত হলাম মায়ের হাতের বা ছড়ির নির্ঘাত আশীর্বাদের ভয়ে। এরই মধ্যে সময়সী এক মেয়ে সুখবরটা মায়ের কানে সযত্নে পৌছে দিয়েছে।

আমার ভয়ের ঘোর না কাটতেই দেখি আমার পিঠে অবিরাম মায়ের হাতের চপেটাঘাত চলছে। আর মা কান্না জড়ানো কণ্ঠে কি যেন বলছেন যা এখন আমার একটুও মনে নেই। কিন্তু মনে আছে আমি একটুও কাদিনি। আমাকে মেরেছেনও মা, কেদেছেনও মা।

আজ এতোদিন পরে মা নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন ঘটনাটা। এখন ইচ্ছা করলে প্রতি মাসে মাকে একটা শাড়ি দিতে পারি। যখনই মনে পড়ে সেদিনের সেই ঘটনাটা, সিক্ত হয়ে উঠে দুই চোখ। মনে হয় এটা আমার সেদিনের সেই বকেয়া কান্না।

পিডিবি কলোনি, সৈয়দপুর থেকে

স্বপ্ন ভঙ্গ

– মিতু রহমান

আমি তখন ষোড়শী। মধ্যবিত্ত সংসারে পিতৃহীন এক মেয়ের দামি কিছু আবদার করার সুযোগ কম। তবু শখ হলো একটা কাতানের থু পিস পরার। বড় ভাই ঢাকা শহরে বড় যুদ্ধ করেন একটা অবস্থানে

পৌছানোর চেষ্টায়। তবে আমাদের সংসার, লেখাপড়ার খরচ উদার হৃদয়ে দিয়ে আসছিল। নিজের বাচ্চাদেরকে অতৃপ্ত রেখে আমার মৌলিক চাহিদা পূরণে এতোটুকু কার্পণ্য করেননি। তবুও একটা দামি থু পিস চাইবার মতো মানসিকতা আমার কেন যেন কাজ করলো না।

কিন্তু শখের কাছে আমি হেরে গেলাম। চিঠি লিখলাম মেজদুলাভাইকে আবদার করে। দুলাভাই সানন্দে আমার শখ পূরণে থু পিস খুজতে লাগলেন। এক সময় দোকানদার পরামর্শ দিল কাতান থু পিস না কিনে একটা শাড়ি নিয়ে যান। পুরুষ মানুষ যা বুঝলো তাই করলো। সুন্দর একটা চকলেট কালারের সোনালি কাজ করা কাতান শাড়ি প্যাকেট করে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। সেটা দেখে প্রথমেই আমার কান্না পেল। শাড়ি দিয়ে আমি কি করবো? সবাই দেখে বললো, ভালোই হলো, তোর বিয়ের দিন এটা পরবি। খবরদার যেন কেটে জামা বানাস না, যত্ন করে রেখে দে।

সেই থেকে স্বপ্ন দেখা শুরু। আমি শ্যামলা। চকলেট কালার শাড়িতে আমাকে মানাবে না জেনেও কি এক অনুভূতি ভেতরে উকি মারছিল। তাই তো! কাতান শাড়ির সঙ্গে বিয়ে বিয়ে একটা গন্ধ পাচ্ছি। আমি কাতান শাড়ি পরবো, আমার পাশে বসা থাকবে অচেনা এক যুবক। মনটা যেন ধরা ছোয়ার বাইরে চলে যাচ্ছিল। আমার শূন্য মন ভরে গেল কি এক অজানা ভালোলাগায়। যতোবার শাড়িটা ছুয়ে দেখছিলাম ততোবারই ভেসে উঠছিল বৌ সাজা একখানা মুখ, আমার মুখ। ছোটভাইয়া বিদেশ থেকে একটা হার্ট আকা আংটি এনে দিয়েছিলেন। শাড়ির সঙ্গে যেন তা সোনায়ে সোহাগা। ইশ! সেই সময়ের সেই আবেগ, সেই কল্পনার রঙ আর তুলিতে ধরতে পারবো না। কতো অতীত, সে দিনগুলো ভুলতে বসেছি প্রায়!

এখন বিয়ের দামি কাতান পরি। কিন্তু সেই মিষ্টি এবং পবিত্র ভালোলাগা মনে দোলা দেয় না। চুপি চুপি আয়নার সামনে দাড়িয়ে শাড়ির আচলে ঘোমটা টেনে লজ্জায় লাল হই না। কোথায় গেল সে লজ্জা? আলমারির হ্যাঙ্গারে শাড়িটা ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। যতোবার সেটা খুলতাম ততোবারই হাত দিয়ে ছুয়ে দেখতাম। হারিয়ে যেতাম কোথায়, কোন অজানায়। না, স্তূপে স্তূপে সাজানো আমার স্বপ্ন, কল্পনা বাস্তবে রূপ নিল না।

ফার্স্ট ইয়ারের ইনোসেন্ট সময় পেরিয়ে এক সময় ডিম্বিতে পা রাখলাম। ফাইনাল সামনে। ছোটভাইয়ার বিয়ে ঠিক হলো। সবাই বললো, শাড়িটা ওর বৌকে দিয়ে দে, তোর বিয়ের সময়ও তোকে লেটেস্ট মডেলের কাতান শাড়ি কিনে দেবে। বুক ফেটে যাচ্ছিল তবু এক প্রকার অভিমান করেই শাড়িটা দিয়ে দিলাম বিয়ের সুটকেসে। কেউ জানলো না নিজ হাতে আমার লালিত স্বপ্নগুলোকে ভেঙে চূরমার করে দিলাম। আমার কি দোষ? অবুঝ বয়সে কেন আমায় কাতান শাড়ি দেয়া হলো! কেন বিয়ের প্রসঙ্গ টানা হলো? আমি তো স্বপ্ন দেখতে চাইনি। বুকে অব্যক্ত কষ্ট আর মুখে হাসি নিয়ে বিয়ের দিন সকালে মার্কেটে গেলাম। এসে শুনি মামাতো ভাই অতি যত্ন করে শাড়িটা ইস্ত্রি করতে গিয়ে আচল পুড়িয়ে ফেলেছে। সবার মুখে একটাই কথা, বিয়ের শাড়ি পুড়ে গেল! কেউ জানলো না আমার ভেঙে যাওয়া মনটা কিভাবে বলসে গেল। অবশ্য পরে বিয়েটাও কোনো এক অদৃশ্য কারণে ভেঙে গেল। সেই সুটকেসে যোগ হলো নতুন শাড়ি বিয়ে হলো অন্যখানে। আমাকে নতুন শাড়ি কিনে দেয়ার অঙ্গীকার নিমেষে বিলীন হয়ে গেল।

সেই পোড়া শাড়িটা জানি না কোন নেশায় আবারও আলমারিতে ভাজ করে তুলে রাখলাম। আগের মতো আর স্পর্শ করি না, ভালোও বাসি না। কেমন যেন অবহেলার বস্তু হয়ে রইলো। ভাঙা স্বপ্ন কি আর জোড়া দেয়া যায়? বোধহয় না।

সিদ্ধান্ত নিলাম ওকে কেটে ফেলবো। শাড়িতে যুবতী মেয়ের যে অনুভূতি, সালোয়ার কামিজের সে অনুভূতি নেই। মেজআপু খুলনায় এলে ওকে দেখাতেই ওর পছন্দ হয়ে যায়। বিনিময়ে ও আমাকে নতুন একটা থু পিস কিনে দেয়। ও ফর্শা। ওকে দারুণ মানিয়েছিল। হাতবদল হতে হতে শাড়িটা যথাস্থানে গিয়ে পড়ে। মেজদুলাভাইয়ের হাতের জিনিস তার ঘরেই ফিরে গেল। মাঝে রেখে গেল এক ঝাক কষ্ট অনুভূতি, স্বপ্ন আর শিহরণ।

সেই শাড়িটার কথা আজো মনে পড়ে। ওর ওপর অভিমান, রাগ, তবু কেন ওকে মন থেকে সরাতে পারি না। মনে হয় আলমারি খুললেই ওকে বুলে থাকতে দেখবো। না নেই, ওর থেকে অনেক বেশি দামি কাতান শাড়ি আজ ওর স্থানে ঝুলছে। কিন্তু সেই ভালোলাগা নেই, ভালোবাসা নেই। হোক সে পোড়া, তবুও আমার যৌবনের প্রথম শিহরণ, প্রথম স্বপ্নের সঙ্গী। আর কোনোদিন ওকে ফিরে পাবো না।

সামছুর রহমান রোড, খুলনা থেকে

আকাশিআপা

– মোহাম্মদ সুলতান মাহমুদ

সে অনেক দিন আগের কথা। আমি তখন ঢাকা গভর্নমেন্ট কলেজের এইচএসসি ফাস্ট ইয়ারের ছাত্র। ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি ইন্টারসিটি ট্রেন তিস্তায়। হাতে কোনো টাকা পয়সা নেই। কোনো রকমে শর্টকাটে টিকেটটা কেটেছি। আমার সিটে বসে আছি। আমার বিপরীত মানে আমার সামনের সিটে একজন ভদ্রমহিলা। তার কোলে তিন চার বছরের একটি ফুটফুটে শিশু। শ্যামলা বর্ণের এই মহিলাকে কেন জানি না আমার কাছে অপূর্ব লাগছে। তার পরনে হালকা আকাশি রঙের শাড়ি, তার সঙ্গে ম্যাচ করা ব্লাউজ, স্যানডাল, কপালের টিপ, এমনকি হালকা গয়নাগুলো পর্যন্ত। মানুষ এতো সুন্দর হতে পারে অথবা মার্জিত মানানসই পোশাকে তাকে এমন অপূর্ব রূপে গড়ে তুলতে পারে এটা আমার ভাবনার ভেতরে ছিল না। এই অপরূপ মহিলার বয়স মনে হয় ত্রিশের বেশি হবে না। চোখে তার সোনালি ফ্রেমের চশমা। তাকে অত্যন্ত মোহনীয় মার্জিত ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ মনে হচ্ছে। সহজ, সরল, নির্মল সৌন্দর্যের কাছে মানুষের একটা শ্রদ্ধা বোধ থাকে। এই মহিলার রূপে সে রকম কিছু একটা আছে। তার বাচ্চাটি ভীষণ দুষ্টমি করছে। জানালার কাছে যাচ্ছে, আমার কাছে আসছে, মুখে ভেংচি কাটছে, এটাওটা অনর্গল প্রশ্ন করছে। চাদের মতো এই বাচ্চাটির দুষ্টমি আমার বেশ ভালো লাগছে। ভদ্রমহিলা বাচ্চাটিকে সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। বাচ্চাটি কোলে নিলাম। মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বললাম, সোনামণি, তোমার নাম কি?

ফ্যাল ফ্যাল করে আমার মুখের দিকে সে চেয়ে রইলো। ভদ্রমহিলা বললেন, বলো বাবা, তোমার নাম বলো, তিনি তোমার মামা।

ধক করে উঠলো আমার হৃদয়টা। এই রকম একজন অপরাধ স্বর্গের হরপরী আমার মতো একজন কেবলা টাইপের ছেলেকে ভাই ভাবছে। সত্যিই আনন্দের কথা! গর্বে যেন ট্রেনসহ আমি আকাশে উঠছি।

যাই হোক। বাচ্চাটিকে নিয়ে টুকটাক খেলছি আর ওনার সঙ্গে মাঝে মধ্যে দুই একটা পরিচয় পর্ব বিষয়ক কথা বলছি। তিনি সরকারি কলেজের একজন প্রভাষক। স্বামী ইউনিভার্সিটির শিক্ষক। সন্দেহ নেই ওনারা উচ্চ শ্রেণীর লোক। আমার খুব উসখুস লাগছিল ওনার সঙ্গে কথা বলতে কখন কোন ক্রটি ধরা পড়ে। ভীষণ ক্ষুধা লাগছে। টাকা পয়সা নেই তা আগেই বলেছি। খাবার গাড়িতে গিয়ে তো আর বাকিতে খাওয়া যাবে না। বড়জোর দুই তিন গ্লাস পানি খেয়ে ক্ষুধার্ত পেটকে কিছুটা সান্ত্বনা দেয়া যাবে। জামালপুর পৌছাতে কমপক্ষে আরো দুই ঘণ্টা লাগবে। পেটকে ধৈর্য ধরার উপদেশ ছাড়া আর কিছুই দিতে পারবো না। সকালে তাড়াহড়ার জন্য কিছু খাওয়া হয়নি।

রেজেক-এর মালিক আল্লাহ কথাটার জ্বলন্ত প্রমাণ হাতে নাতেই পেলাম। মহিলাটি কি বুঝলেন জানি না। হঠাৎ করেই তিনি ব্যাগ থেকে পাউরুটি, মিষ্টি এবং কিছু ফলমূলের একটি পাত্র আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। কিছু মনে করো না, তুমি আমার ছোটভাইয়ের মতো, এগুলো খেয়ে নাও।

তার কথায় এবং আচরণে মমত্ববোধটা এতো বেশি ছিল যে তা অমান্য করার সাহস আমার হলো না। বাধ্য ছেলের মতো লক্ষ্মী প্রতিমা মায়ের সামনে খাওয়া শুরু করে দিলাম। মনে মনে বিধাতাকে ধন্যবাদ দিতে লাগলাম এমন একজন ভালো মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেয়ার জন্য।

এখনো মাঝে মধ্যে ভাবি। এতো স্বল্প সময়ে সম্পূর্ণ অপরিচিতা একজন মহিলা কিভাবে আমার আপন হয়ে গেলেন। হৃদয়ের মাঝে এমন একটা দাগ কেটে গেল যে দাগ আর বাকি জীবনে মোছার নয়। আজো চমকে উঠি আকাশি রঙের শাড়ি পরা মহিলাদের দেখলে।

সাধুপুর, মেলান্দহ, জামালপুর থেকে

থু স্টার থ্রপ

– মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম রোমার

পার্বতীপুর কলেজের ১৯৮০ সালের ফার্স্ট ইয়ারের থু স্টার থ্রপের কাহিনী। আমি ইবলিস আমিরুল, টেস্টার আবু, পূর্ণিপাল মিজানুর প্রত্যেকে দুষ্টমির জন্য নামের আরো খেতাব প্রাপ্ত। এমন কোনো কাজ নেই যা আমাদের দ্বারা হয় না। গাছের ফল চুরি থেকে শুরু করে মেয়েদের উত্যক্ত করা পর্যন্ত সব কিছুই থু স্টার থ্রপের কাজ। পড়ালেখাতেও আমরা সায়েন্সের সেরা তিন।

আমাদের বাসা ছিল সাহেবপাড়ায়। রেলওয়ের বিশাল বাংলো। চারদিকে গাছে ভরা। রাস্তা থেকে আমাদের বাসাটা আড়ালে। আশু রেলওয়েতে চাকরি করেন সৈয়দপুরে। সকালে চলে যান। আশু প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। সকাল নয়টায় চলে যান। দুজনই বিকেলে ফেরেন। আমি একমাত্র

সন্তান। বাসায় সব সময় থাকে বয়স্ক বুয়া যাকে নানি বলি। নানি কাজ নিয়ে ভেতরেই থাকে। যেদিন কলেজ থাকে না সেদিন ফাকা বাসায় আমি, পুন্সিপাল আর টেস্টার জমিয়ে আড্ডা দিই।

ডিগ্রি পরীক্ষার জন্য কলেজ বন্ধ, চারদিকে বন্যা। গ্রাম থেকে শহরের নারী-পুরুষের ভিড়। সকলেই সাহায্য চায়। আমি আর পুন্সিপাল ঘরে বসে গান শুনছি। টেস্টার সিগারেটের জন্য বাইরে গেছে। অনেকক্ষণ পর ফিরলো। পুন্সিপালের দারুণ সিগারেটের নেশা ধরেছে। টেস্টারের দেহের জন্য গালাগালি দিতে লাগলো। টেস্টার চুপচাপ। আমরা মনের সুখে সিগারেট টানছি। কিছুক্ষণ পর টেস্টার বাইরে গেল। চিন্তিত মনে চুপচাপ ঘরে ফিরলো।

কিরে টেস্টার, কি হয়েছে?

না চারদিকে বন্যায় মানুষের কতো অভাব। কতো লোক খেতে পারছে না, কাপড় নেই। দুঃখ লাগে। শালা পলিটিশিয়ান হবে!

না দোস্ত। সিগারেট আনার সময় গেটে দেখি দুইটা মেয়ে দাড়িয়ে। মোটামুটি সুন্দরী। দুইদিন থেকে অনাহারে। কাপড়টাও ছেড়া। কোনোমতে গায়ে জড়িয়ে আছে। সাহায্য চাইলো। কিন্তু কিছুই দিতে পারলাম না।

পুন্সিপাল লাফ দিয়ে টেস্টারকে জড়িয়ে ধরলো। বন্ধু নিয়ে আয়। একটু নেড়ে দেখি।

আমিও বললাম, নিয়ে আয়, আমি বাসা থেকে কিছু চাল দেবো।

আমাদের কথায় টেস্টার হাসতে হাসতে বললো, টেস্টার টেস্ট করার জন্য অলরেডি নিয়ে এসেছে।

কোথায় বন্ধু? টেস্টারকে জড়িয়ে ধরলাম আমি আর পুন্সিপাল।

বাইরে আছে, বলে টেস্টার আমাদের নিয়ে বাইরে এলো।

বাইরে এসে দেখি কাঠাল গাছের নিচে দুই মেয়ে দাড়িয়ে। বয়স বিশ বাইশ। মলিন মুখ, পরনের ছেড়া শাড়ি দিয়ে যৌবনের চিহ্নগুলো কোনোমতেই ঢাকতে পারছে না। পুন্সিপালের আর সহ্য হলো না, একজনের বুকে হাত দিয়ে বললো, চলো, ভেতরে চলো, আমাদের থু স্টারকে একটু সুখ দাও। আমরা তোমাদের সাহায্য করবো।

মেয়ে দুজন পুন্সিপালের কথার কোনো প্রতিউত্তর না করে শুধু মাটির দিকে চেয়ে থাকলো। বাইরে এভাবে দাড়িয়ে থাকা রিস্কি। আমি আর টেস্টার পুন্সিপালকে সরিয়ে দিয়ে দুজনকে ঘরে নিয়ে এলাম। পুন্সিপাল ভেতরে এসেই কোনো কথা না বলে একজনকে নিয়ে এক ঘরে চলে গেল।

আমাদের দুজনের কাছে একটি মেয়ে। শুধু দেহ ভোগ করলেই চলবে না। টাকাও নেই যে দেবো। টেস্টারকে আড়ালে ডেকে বললাম, তোদের কাছে কি টাকা আছে?

না। টেস্টারের সরাসরি উত্তর। কেন, তুই তো চাল দিবি!

আমি না হয় দুই এক সের চাল দেবো। তাতে কি হবে, যদি তা না মেনে হই চই করে।

শুধু কি চালই দেবো? কাপড়ও দেবো। চিন্তা করিস না দোস্ত। আগে কাজ সারতে দে। আমি আর পুন্সিপাল সব ব্যবস্থা করে দেবো বলে অপরজনকে নিয়ে টেস্টার ঘরের দরজা বন্ধ করলো।

আমি বাইরে অপেক্ষা করছি আর চিন্তা করছি। চাল না হয় দুই-এক সের দিলাম। কাপড় পাবো কোথায়? মাথায়ও কোনো বুদ্ধি আসছে না। আম্মুর শাড়ি আছে। কিন্তু নিজের মায়ের শাড়ি। অসম্ভব। হঠাৎ টেস্টার বেরিয়ে এলো দরজা খুলে।

যা দারুণ জিনিস। মনের সুখে এনজয় কর।

টেস্টারকে আবারও আড়ালে ডেকে নিলাম।

আমি না হয় দুই-এক সের চাল দিলাম। কিন্তু তাতে কি সমস্যা মিটবে?

চিন্তা করিস না। আমি শাড়ি দেবো।

কোথায় পাবি শাড়ি?

তোর মাথায় একটুও বুদ্ধি নেই। ওই দেখ শাড়ি, বলে আমার মাথাটা ঘুরিয়ে দেখালো।

একটু দূরেই পাশের বাড়ি শোভাদের। ফাকা বারান্দায় চার পাচটা শাড়ি শুকাতে দেয়া।

ওগুলোই আমরা ওদের দিয়ে দেবো। টেস্টারের সোজা উত্তর। যা তাড়াতাড়ি এনজয় কর, বলেই পুন্নিপালের ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে বললো, পুন্নিপাল তাড়াতাড়ি, আমি রেডি।

এনজয় শেষে টেস্টারের প্রস্তাব, চল শাড়ি কয়টা চুরি করে আনি।

বারান্দায় কেউ নেই। ভরদুপুর। ঘর থেকে ব্যাগে করে চাল দিলাম হাফ ব্যাগ। শাড়িগুলো ভাজ করে ব্যাগের নিচে দিলাম। উপরে দিলাম চাল যেন কেউ শাড়িগুলো দেখতে না পায়।

টেস্টার এক মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বললো, লক্ষ্মীরা, এ শাড়ি পরে যেন এ পাড়ায় এসো না। এলে নিজেরা মরবে, আমাদেরকেও মারবে।

এরপর থেকে আমরা থু স্টার থ্রপ ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত দুই বছর কতো যে শাড়ি চুরি করেছি আর কতো মেয়েকে সেই শাড়ি উপহার দিয়েছি তার হিসাব দিতে পারবো না যা আজ শুধুই ইতিহাস।

সূত্রাপুর, বগুড়া থেকে

চাদ

- সুমী

ছোটবেলা থেকেই আমার শাড়ি গয়নার প্রতি তেমন একটা টান ছিল না। বিশেষ করে শাড়ির প্রতি। বাইশ বছর বয়সেও আমার জমানো কোনো শাড়ি ছিল না। মা মাঝে মাঝে দুঃখ করে বলতেন, মেয়েরা কতো শখ করে মায়ের নতুন শাড়ির ভাজ ভেঙে পরে। কিন্তু আমার মেয়েটা যে কি, কখনো ভুল করেও শাড়ি পরার কথা মুখেও আনে না।

স্কুল-কলেজে বন্ধু-বান্ধবীদের অনেক জোরাজুরিতেও কখনো সেভাবে শাড়ি পরা হয়ে ওঠেনি। মোটকথা, শাড়ি জিনিসটাই আমার কাছে খুব বিরক্তিকর মনে হতো।

ইউনিভার্সিটি ছাড়ার আগে হঠাৎ করেই এক ছেলের প্রেমে পড়লাম। সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে তাকে ভালোবাসলাম। জীবনের সমস্ত সঞ্চিত ভালোবাসা, ভালোলাগা তার হাতে তুলে দিলাম, সেও প্রতিদান দিতে কুণ্ঠা বোধ করেনি।

যদিও জানি আমরা কখনোই সংসার করতে পারবো না। কারণ তার আর আমার মাঝে অনেক বাধা যে বাধা অতিক্রম করা তার বা আমার কারো পক্ষেই সম্ভব না। কখনোই তাকে একান্ত আপন করে পাবো না। তবুও সমাজ, সংসার, সংস্কার সব কিছুকেই উপেক্ষা করে আমরা বিয়ে করলাম। বিয়েতে

আমার স্বামী আমাকে তেমন কিছুই দিতে পারেনি। কেননা বিয়ের দিন সে নিজেও জানতো না যে, আজ আমাদের বিয়ে হচ্ছে। কিছু না দিতে পারার জন্য যে তার প্রচণ্ড মানসিক কষ্ট হচ্ছিল তা বুঝতে পারছিলাম।

যাহোক, বিয়ের এক মাস পর গত পহেলা বৈশাখে সে আমাকে প্রথম একটা শাড়ি গিফট দিল! খুবই সাধারণ একটা শাড়ি। শাদা জমিন, লাল পাড়। দুই দিন পর যখন কর্তব্য রক্ষার্থে শাড়িটা পরে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম তখন সে এমন মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল যে, সেই মুগ্ধতা আমাকে প্রচণ্ড লজ্জায় ফেলে দিয়েছিল। সেই দৃষ্টিতে আমার সমস্ত পৃথিবীকে খুজে পেয়েছিলাম। তার চোখে তখন আমি হয়তো ছিলাম পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী নারী। সে আমার কপালে চুমু দিয়ে শুধু একটা কথাই বললো, *আমার চাদ।*

আমার সমস্ত শরীর এক অদ্ভুত ভালোলাগায় ভরে গেল যে ভালোলাগার সঙ্গে আমার আগে কখনো পরিচয় ছিল না। এখন সে প্রায়ই আমাকে বলে, সুমী, শাড়িতে তোমাকে সবচেয়ে বেশি সুন্দর লাগে। রাস্তায় কোনো মেয়েকে শাড়ি পরে দেখলেই সে চট করে বলে ফেলে, এই শাড়িটা আমার বৌকে পরলে বেশি সুন্দর লাগতো।

আজ তাই ভাবি, যে শাড়ি পোশাকটাকে এতো অবহেলা করেছি সেই শাড়িই আমার কাছে এখন সবচেয়ে পছন্দের বস্তু। এ শাড়িই আমাকে আমার স্বামীর চোখে সবচেয়ে সুন্দরী করে তুলেছে। তাই আমার স্বামীর দেয়া বিয়ের প্রথম শাড়ি আমার সারা জীবনের সঞ্চয়ের সবচেয়ে বড় ভালোবাসার সম্পদ। তাকে সব সময় কাছে পাই না। কিন্তু যখনই তার দেয়া শাড়িটা পরি তখনই মনে হয় আমার স্বামীর ভালোবাসার স্পর্শ আমার শরীরে জড়িয়ে আছে এবং কানের কাছে একটা কথাই রিনিঝিনি বাজে, *আমার চাদ।*

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন রাজশাহী থেকে

অমঙ্গল

– ফারুক আহমেদ

শাড়ি আমার জীবনের সুখ এবং দুঃখ দুইয়েই আবর্তিত। শাড়ির জন্য আমার জীবনের নতুন অধ্যায় সূচিত হয়েছে।

১৯৯১ সাল। আমি তখন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি কলেজের বিএসসি (রসায়ন)-এর ছাত্র। ঠাকুরপাড়ায় একটি বাসায় কয়েক বন্ধু মিলে মেস করে থাকতাম। রোজার মাস উপলক্ষে কলেজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এদিকে প্রাইভেট পড়া থাকায় বাড়িতে যেতে পারছি না। এক বন্ধু তার এক খালাতো ভাইকে পড়াতে বললো। আগে কখনো টিউশনির অভ্যাস ছিল না। তাই তাকে না করে দিলাম।

সে বললো, সামনে রোজার মাস, ক্লাস নেই, পড়ার ফাকে এক ঘণ্টা করে পড়ালে ক্ষতি কি। তার পীড়াপীড়িতে অবশেষে রোজার তিন দিন আগে থেকে পড়াতে শুরু করলাম। ছাত্রটির নাম ছিল রাসেল।

সে জেলা স্কুলের ক্লাস নাইনের ছাত্র। প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে নয়টা পর্যন্ত তাকে পড়াতাম। এর মধ্যে রোজা প্রায় শেষ পর্যায়ে। আমি থামের বাড়িতে চলে আসবো পচিশ রোজার দিন।

ছাত্রটি আমাকে একটি খাম দিয়ে বললো, স্যার, এটা আশু আপনাকে দিয়েছেন।

খুলে দেখি সেখানে একশ টাকার পাচটি নোট। বুঝলাম এটা আমার জীবনের প্রথম রোজগারের টাকা। টাকাটা পেয়ে ভাবলাম কি করি। ঠিক করলাম মাকে একটা কাপড় দেবো। ইফতারের পরে বন্ধু ইপক-কে নিয়ে মার্কেটে চলে গেলাম। ঈদ উপলক্ষে প্রতিটি দোকানে প্রচণ্ড ভিড়। বিভিন্ন দোকান ঘুরে অবশেষে কান্দিরপাড়ের একটি দোকানে ফাকা দেখে শাড়ি দেখতে লাগলাম। আগে কখনো শাড়ি কেনার অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই কাপড় পছন্দ হচ্ছে না। এই দোকানে একজন মহিলা ও একটি মেয়ে এসে ঢুকলো। মেয়েটি ঢুকতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। সে ছিল অপরাধী সুন্দরী। তাকে মনে হয়েছিল যেন এ যুগের ক্লিওপাত্রা। তার দিকে নিমগ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। মেয়েটিও আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। মনে হয় লজ্জা পেয়ে সে শাড়ি দেখতে লাগলো। একটু পর পর দৃষ্টি বিনিময় হতে লাগলো। তারা দুটি শাড়ি পছন্দ করে কিনলো। আমিও চারশ টাকা দিয়ে একটি শাড়ি কিনে নিলাম। দোকান থেকে বের হয়ে তারা রিকশা ডেকে উঠে পড়লো। যাওয়ার সময় সে বার বার পেছনে তাকাতে লাগলো। আমি শুধু তার চলে যাওয়ার পথের দিকে মস্তমুগ্ধের মতো চেয়ে রইলাম। কেন জানি নাম, ঠিকানা বা তার সঙ্গে কথা বলতে পারলাম না। ইপকের ধাক্কায় সখিবৎ হলে মেসে চলে এলাম। পরের দিনও মার্কেটে গিয়ে তাকে খুজলাম। সাতাশ রোজার দিন বাড়িতে চলে এলাম। কিন্তু বাড়িতে মন বসাতে পারলাম না। সারাক্ষণ তার ছবি মনে ভাসে, সব কিছুতে অস্থিরতায় কাটে। ঈদের পরে কুমিল্লায় চলে গেলাম।

ঈদের প্রায় এক মাস পরে রসায়নের হাশেমস্যারের কাছ থেকে প্র্যাকটিকাল খাতার সাইন নেয়ার জন্য কলেজের ইন্টারমিডিয়েট সেকশনে গেলাম। ফেব্রার পথে মেয়েদের কমনরুমের সামনে দিয়ে আসছিলাম। হঠাৎ যেন আমার শরীরের রক্ত সঞ্চালন থেমে গেল। যাকে আমি মনে মনে খুজে বেড়াই শাড়ি দোকানের দেখা সেই রাজকন্যাটি। আমাকে দেখে সে মুচকি একটা হাসি দিল। কি বলবো ভেবে পাচ্ছি না। প্রথমে সে বললো, কেমন আছেন?

বললাম, ভালো নেই।

পরিচয় হলো। তার নাম ইভা। সে ইন্টারমিডিয়েট ফাস্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছে। ওই দিন আর বেশি কথা হয়নি। আগামীকাল সকাল দশটায় ধর্ম সাগরের পাড়ে আসতে বলে চলে গেলাম। মনে করলাম সে আসবে না। কিন্তু সে আমার আগে সেখানে এসে পড়েছে। সেদিন অনেক কথা হলো। তারা দুই ভাই, এক বোন, সে সবার বড়। বাবা পোস্ট অফিসের সিনিয়র অফিসার। কখনো কলেজে, পার্কে, ফাস্ট ফুডের দোকানে, ধর্মসাগরের পাড়ে, কখনো বা রিকশায় অশ্বগতিতে চলতে লাগলো আমাদের ভালোবাসা। দুজনে স্বপ্ন দেখতে লাগলাম ঘর বাধার। ১৯৯৪ সালে আমি মাস্টার্স শেষ করে একমি-তে চাকরি নিলাম। সেও জীববিজ্ঞানে ভর্তি হলো।

১৯৯৫ সালে আমাদের পারিবারিক সম্মতিতে বিয়ে ঠিক হলো। সংসারের বড় ছেলে বলে বাবা এবং মামা মিলে নিমন্ত্রণ থেকে শুরু করে বিয়ের যাবতীয় কাজ সম্পূর্ণ করলেন। আমাকে শুধু মিরপুর থেকে বিয়ের শাড়ি আনতে বললেন। অফিস থেকে বিশ দিনের ছুটি নিয়ে দুটি শাড়ি কিনে রওনা হলাম।

ব্যাগে আমার কাপড়-চোপড়ে জায়গা না হওয়ায় পলিথিনে ভরে গাড়িতে উঠে ব্যাগসহ শাড়ির পলিথিন দুটি লাগেজ ক্যারিয়ারে রেখে দিলাম। বাস চোদ্দগ্রাম এসে পৌছালে তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে বিয়ের একটি শাড়ি ভুলে গাড়িতে রয়ে গেল। রাত বেশি হওয়ায় গাড়ির খোজ নিতে পারলাম না। বাড়ি এসে শাড়ি হারানোর কথা শুনে মুরগন্দির সবাই বললেন এটা ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের লক্ষণ। দুই দিন পরে ঢাকা থেকে আরেকটি শাড়ি নিয়ে এলাম।

নির্দিষ্ট দিনে আমাদের বিয়ে সম্পন্ন হলো। বাসর রাতে দুজন হারিয়ে গেলাম স্বর্গীয় সুখের আবেশে। পৃথিবীর সমস্ত সুখ যেন ঠিকরিয়ে পড়ছে ওই রাতে। আমাদের দাম্পত্য জীবন সুখে কাটতে লাগলো। দুবছর পরে ইভা অন্তঃসত্ত্বা হলো। খুশিতে আমি এবং বাবা মা সবাই আত্মহারা হয়ে গেলাম। ডাক্তার চেক করে বললো সব কিছু ঠিক আছে, পচিশ তারিখে প্রসব হবে। প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অফিসের ব্যস্ততায় তেইশ তারিখে ইভাকে কুমিল্লা মেডিক্যাল সেন্টারে ভর্তি করে ঢাকায় চলে গেলাম।

পচিশ তারিখ রাত দশটা কুমিল্লা থেকে ফোন এলো আমার মেয়ে হয়েছে। কিন্তু ইভা মারা গেছে।

অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে সে মারা গেল। সকালে কুমিল্লা থেকে বাড়ি এনে কবর দিয়ে দিলাম।

সেই যে ঢাকা থেকে এসেছি, আজো আর চাকরিতে যাইনি। দেশে একটি হাই স্কুলে শিক্ষকতা করছি। প্রাকৃতিক নিয়মে সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আজ আমার মেয়ে মারিয়া হাটতে পারে, মিষ্টি কথা বলে। বামা-মা আমাকে বিয়ে দিতে চাচ্ছেন। কিন্তু ইভাকে তো ভুলতে পারবো না। কারণ বিয়ের শাড়ি দেখলে মনে পড়ে যায় এতে কোনো অমঙ্গল লুকিয়ে আছে কি না।

কুমিল্লা থেকে

অভিমান

- সফি

কয়েক বন্ধু মার্কেটের সামনে দাড়িয়ে চা খাচ্ছি। এমন সময় মার্কেটের ভেতরে হই চই শুনে এগিয়ে গেলাম। গিয়ে লোকমুখে যা শুনলাম তা এ রকম - দোকান থেকে কেনাকাটা শেষে চলে যাচ্ছে দুই মহিলা। এমন সময় মার্কেটের ভেতরে আড্ডারত কয়েকজন বখাটে ছেলেদের মধ্যে একজন স্বাস্থ্যবান মহিলাটির পেছনে ঢুকে যাওয়া শাড়ি টেনে ঠিক করে দেয়। এতে মহিলা ভীষণ রকম চটে যায়।

প্রতিউত্তরে বখাটে ছেলেটি, ঠিক আছে আপা, অন্যায় যখন করে ফেলেছি তো আগের মতোই থাক বলে আঙুল চালিয়ে শাড়ি আগের জায়গায় ঢুকিয়ে দেয়। বখাটেগুলো পরিস্থিতি বুঝে সটকে পড়ে। এবং ঘটনার আকস্মিকতায় মহিলার তো ছেড়ে দে মা কেদে বাচি অবস্থা।

নিশা কয়েকদিন থেকেই বলছে বৈশাখী মেলায় যাবে। অফিসের কাজের চাপে সময় হয়ে উঠছিল না। বললাম, শুক্রবারে যাবো। এমনিতেই শুক্রবার, তার উপর আবার মেলার শেষ দিন। দুই শ্যালিকাসহ তিনজনকে আমার একার পক্ষে মেলায় নিরাপত্তা দেয়া ছিল কঠিন। মেলায় যাওয়ার আগে বাসায় শ্যালিকা দিশার সঙ্গে ইয়ার্কি করলাম। কি ছোট গিনি, তোমাকে তো আজ ফেরানো যাবে না, কে যে টেনে নিয়ে যায়?

আজকেই প্রথম বিয়ের পরে দিশাকে শাড়ি পরা দেখলাম। নিশার (আমার সবচেয়ে পছন্দের) শাড়ি-
ব্লাউজে খুব মানিয়েছে। প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে এক স্টল থেকে অন্য স্টলে যাওয়ার সময় নিশার হাত ধরে
এগোচ্ছি। একটু এগোনোর পর পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখি নিশার (স্ত্রী) বড় বড় চোখ। আসলে
এতোক্ষণ যার হাত ধরে যাচ্ছি সে হাত নিশার ছিল না। ভুল করে দিশার হাত ধরেছি। এ ভুলের
কারণ ছিল শাড়ি। বাসায় গিয়ে নিশার অভিমান ভাঙাতে কানে কানে বললাম, কি, শাড়ি ধার দেবে?
সে বললো যাহ! দুষ্ট কোথাকার।

বলগাড়ি, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর থেকে

বর্ষাবরণ

– বনলতা

বাসর রাতের প্রথম সাড়ে তিন ঘণ্টা আলাপচারিতায় কাটলো। আলাপের শুরুতে আড়ষ্টতা ছিল।
ধীরে ধীরে আড়ষ্টতা কেটে গিয়ে স্বাভাবিকতা স্থান পেল। তিনি তার হাতে আমার হাত রাখলেন। মুগ্ধ
দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার সুন্দর পরী, লাল পরী, নীল পরী, এসো তোমার সঙ্গে
ভাব করি।

ভোরে যখন দূরে কোথাও আজান হচ্ছিল তখন বুঝতে পারলাম মানসিক এবং শারীরিকভাবে এক
শক্তিশালী পুরুষ আমার স্বামী। কিন্তু বাসর রাতে বিড়াল মারার অনীহার কারণেই হোক বা অন্য যে
কোনো কারণেই হোক চূড়ান্ত কর্মটি করা থেকে তিনি বিরত রইলেন। ভালোলাগার এক তীব্র আমেজ
শরীরে জড়িয়ে তার প্রশস্ত বুক মাথা রেখে ঘুমিয়ে গেলাম।

বিয়ের দ্বিতীয় রাত। বিয়ের সাজানির সঙ্গে দেয়া খুব দামি অথচ ঈষৎ খোলামেলা গোলাপি নাইটি
অঙ্গে ধারণ করলাম। শরীরে সুগন্ধি মাখলাম, হাল্কা সাজে সাজলাম। প্রকৃতি থেকে পাওয়া দেহগত
শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য আজ আমি পুরোপুরি প্রস্তুত। গতকাল ভোরের নিষ্পেষণের চূড়ান্ত
পরিণতি আজ হবে ভেবে শিহরিত হচ্ছি। নীল ডিম লাইটের আলোয় তার খুব কাছাকাছি হলাম।
ধরেই নিলাম আজ আলাপচারিতা হবে স্বল্প, দৈহিক শিল্পকলা হবে দীর্ঘ।

কিন্তু আমাকে হতাশ করে দিয়ে কথার ফুলঝুরি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে লাগলো। নারীসুলভ লজ্জার
কারণে অগ্রসর হতে পারছিলাম না। শুধুই ভাবছিলাম তিনি এক পা ডোবালে আমি যে পুরোপুরি
নাইতে নেমে যাবো। এই সাধারণ সত্যটা তিনি কি বুঝতে পারছেন না?

আলাপ করতে করতে ক্লান্ত তিনি এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি হতাশ ও বিরক্ত। তার ঘুমন্ত
নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করলাম, ধৈর্য ধারণ করো কন্যা।

বিয়ের তৃতীয় রাতে আমি কুমারী থেকে নারী হলাম। নিষ্পেষণে উত্তেজিত হলাম। বাধ ভাঙা জোয়ারে
তিনি আমাকে ভাসালেন, নিজেও ভাসলেন। ক্লান্তিহীন পথযাত্রা চলতে লাগলো মাইলের পর মাইল।
মাইলস্টোন গুনি। তবে ক্লান্ত হলাম। সেটা ছিল ভালোলাগার ক্লান্তি।

সকালে ননদের দরজায় নক করার শব্দে ঘুম ভেঙে আমার স্বামীর উদ্ভাসিত মুখের দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলেই ফেললাম, আমি পাইলাম, আমি ইহাকে পাইলাম।

আজ আমাদের বিয়ের এক বছর পূর্তি। আজ আমাদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি। ম্যারেজ ডে-র সকালে আত্মীয়স্বজন এবং প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে প্রিয়তম সখার কাছ থেকে পাওয়া শাড়ির ভাণ্ডার খুলে বসলাম। একশ একচল্লিশটি শাড়ি। বিকেলেই হয়তো একশ বিয়াল্লিশে গিয়ে পৌছাবে। হয়তো বলছি কেন, অবশ্যই পৌছাবে। এক বছরের অভিজ্ঞতায় আমার বুঝতে বাকি নেই আমার স্বামীর প্রিয় শখ আমাকে নিত্য নতুন শাড়িতে জড়ানো। তিনি শাড়ি কিনে আনলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে তা পরার জন্য পীড়াপীড়ি করতেন। আমি শাড়ি পরলে তিনি মুগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকাতেন, জড়িয়ে ধরতেন। আমি গলতে থাকতাম।

এক বছরে তিনি তার স্বাভাবিক এবং সাবলীল আচরণে আমার সমস্ত আড়ষ্টতা কেড়ে নিয়েছেন। এখন আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে আহ্বান করি। তিনি বেশির ভাগ সময়েই দুর্দান্তভাবে সাড়া দেন। মাঝে মাঝে তিনি কেমন যেন নিস্পৃহ হয়ে যান। অফিসের কিংবা অন্য কোনো চিন্তায় তিনি চিন্তিত এই ভেবে আমি রণেভঙ্গ দিতাম। তবে অবধারিতভাবে যেদিন আমি তার দেয়া নতুন শাড়ি পরতাম সেদিন তিনি আমাকে ফালাফালা করে ছাড়তেন। আমি কপট রাগ দেখাতাম। কিন্তু তার দস্যুতার কাছে আমার সে কপট রাগ ধোপে টিকতো না। তিনি আমার শরীর থেকে শাড়ি খুলতেন শৈল্পিক কায়দায়। নিত্য নতুন ভঙ্গিতে। আমার শরীরের ঘ্রাণ নেয়ার আগে তিনি শাড়ির ঘ্রাণ নিতেন। মাদকতায় ভরে যেতো তার দুই চোখ।

আজ ঘোর বর্ষা। বর্ষার প্রথম বৃষ্টি। শব্দরবাড়িতে এসেছি স্বামীসহ। তাদের বসত ঘর দুইটি। চারদিকে টিনের চৌকাঠ দিয়ে ঘেরা, ফ্লোর পাকা, দুটি টিনের চৌচালা ঘর। প্রতিটি ঘরে সাত আটটি করে কামরা। তারপরও আমরা নিজস্ব প্রাইভেসির কারণে শব্দর-শাশুড়িসহ রাতের খাবার খেয়ে ভিন্ন ঘরটিতে ঘুমাতে গেলাম।

একনাগাড়ে বৃষ্টি ঝরেই পড়ছে। যে কোনো দম্পতি মাত্রই জানেন টিনের চালের রিমঝিম বৃষ্টির শব্দ শরীরে নাচন তোলে, শরীর জেগে ওঠে। শরীর কথা বলতে শুরু করে, এক বছর আগের আড়ষ্টতা আমার মাঝে নেই।

তাকে আহ্বান করলাম। তিনি সাড়া দিলেন না। বৃষ্টির টাপুর-টুপুর শব্দে তার শরীর জাগছে না। এ কেমন কথা?

আমি আজ মরিয়া। তাকে জাগানোর সব কৌশল প্রয়োগ করেও দেখলাম তিনি মৈনাক পর্বতের মতো পড়ে আছেন। তার দুই পায়ের মাঝখানে যা পড়ে রয়েছে তা যেন আমার মোরঝা। একটা হোমিওপ্যাথির শিশি থেকে অবিরত ওষুধ গড়িয়ে পড়ছে অথচ সে ব্যাপারে তার কোনো ক্রক্ষেপ নেই। আমি হিংস্র এবং কামুক চোখ বড় বড় করে তার দিকে তাকালাম।

তিনি যা বোঝার বুঝলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে বসালেন। অনুনয়ের সুরে বললেন, একটা লাল টুকটুকে শাড়ি পরো। আজ বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজবো। ঢাকায় তো এ সুযোগ পাওয়া যায় না। চলো সুযোগটা কাজে লাগাই।

মোটামুটি অনিচ্ছা নিয়ে আমি নাইটি খুলে শাড়ি পরলাম। তিনি আমার হাত ধরে ঘোরবৃষ্টির মধ্যে উঠানে নামলেন। উঠান পেরিয়ে দীঘির ঘাটে চলে এলাম। বাধানো ঘাটে দাড়িয়ে দীঘির পানিতে বৃষ্টির ফোটা পড়ার অপূর্ব দৃশ্য দেখতে লাগলাম। দূরে দীঘির পূর্ব কোণায় মিউনিসিপালটির লাইটপোস্টের আলোয় বৃষ্টির ফোটাকে রূপার দানার মতো মনে হচ্ছে। তিনি আমাকে দীঘির পানিতে নামতে আহ্বান করলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মতো পানিতে নামতে লাগলাম। পানিতে নেমে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে জলকেলি শুরু করলেন। আমার রাগ উবে যেতে লাগলো।

তিনি এখন সক্রিয়। পায়ের মাঝখানের মোরঝা এখন স্টেইনলেস স্টিল। তিনি আমাকে কোলে তুলে বাধানো ঘাটের মেঝেতে এনে চিৎ করে শোয়ালেন।

শুরু হলো রেসলিং। প্রকৃতির কোলে শুয়ে এক আশ্চর্য সঙ্গম!

আমার মনে পরতে লাগলো আমাদের বিবাহিত জীবনের এক বছর তিন মাসে আমাকে একটিও থু পিস অথবা নাইটি তিনি কিনে দেননি। ননদের সঙ্গে গিয়ে ড্যান্ডি ডাইংয়ের সুন্দর একটি থু পিস কিনে এনে তাকে একবার দেখালাম।

তিনি পরতে তো বললেনই না, নেড়েচেড়েও দেখলেন না। তার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য বললাম, দেখছো, কি সুন্দর থু পিস। তিনি শুধু বললেন, ও আচ্ছা।

আমার মনে পড়তে লাগলো সালোয়ার-কামিজ এবং নাইটি পরা অবস্থায় তিনি একবারও আমাতে উপগত হননি। আমার চোখে ভাসতে লাগলো বাসর রাতে শাড়ি পরেছিলাম, তিনি হয়েছিলেন দস্যু, দ্বিতীয় রাতে নাইটি পরেছিলাম তিনি হয়ে গেলেন বরফখণ্ড। তৃতীয় রাতে শাড়ি পরেছিলাম তিনি হয়ে গেলেন ডাকাত। আর আজ...

স্বামীর আদর, সোহাগ, নিষ্পেষণ সব মেয়েই চায়। ঘোরবর্ষায় প্রকৃতিতে পিঠ পেতে আকাশের দিকে এবং স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, কন্যা, এখন থেকে শাড়িই তোমার একমাত্র পরিধেয় বস্ত্র।

দক্ষিণ গোড়ান, ঢাকা থেকে

রক্তাক্ত

– রেজা মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ

আমার বাবা ছিলেন প্রাইমারি স্কুলের একজন হেড মাস্টার। এক ভাই, এক বোন মিলে চারজনের সুখী সংসার খুব ভালো করেই চলছিল। বাবা ছিলেন একেবারে নিরীহ লোক। এলাকার কোনো গণ্ডগোলে বাবা কখনো যেতেন না। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! নিরীহ প্রকৃতির আমার এ বাবাকে আজ সহ্য করতে হচ্ছে একমাত্র কন্যার নিষ্ঠুর মৃত্যুবরণ। আজ থেকে পাচ বছর আগে আওয়ামী লীগ সরকার থাকাকালে আমার স্নেহের সুমিআপুকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

আপু আমাদের এলাকার সরকারি কলেজ থেকে তখন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেবেন। ঘটনাটি ঘটে ১৯৯৭ সালের ২৮ এপ্রিল। ওই দিন আপুদেরকে কলেজ কর্তৃপক্ষ বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করে।

আপুদের বান্ধবীরা মিলে অনেক জল্পনা-কল্পনা করেন, কে কতো সুন্দর করে শাড়ি পরে স্যারদের সঙ্গে একত্রে ছবি তুলবে, কে কোন রঙ-এর শাড়ি পরবেন, আরো অনেক কিছু।

ঘটনার আগের রাতে আপুকে মা পরামর্শ দিলেন মায়ের নীল রঙ-এর জর্জেটের শাড়ি পরার জন্য। আপু ফর্সা, সুন্দরী হওয়াতে তাকে খুব ভালো মানাবে। আপুও রাজি হলেন। কিন্তু সমস্যা হলো পেটিকোট ও ব্লাউজ নিয়ে। কারণ আপু এর আগে কখনো শাড়ি পরেননি। শাড়ি পরার অভ্যাস না থাকাতে আপুর এ জিনিসগুলো ছিল না। মায়ের থাকলেও আপুর মাপের সঙ্গে এগুলো মিলছিল না। আপু খুব দৌড়াদৌড়ি করে পাশের বাসার এক ভাবীর কাছ থেকে এগুলো সংগ্রহ করলেন।

সব তরুণী মেয়েরাই শাড়ি পরতে খুব আনন্দ বোধ করে। আমার আপুও সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন না। শাড়ি পরলে কেমন দেখায়, সেটা আগেই ড্রেসিং টেবিলের আয়নাতে আপুর দেখা চাই। তার জন্য আপু খুব ব্যস্ত হয়ে গেলেন। ছোট কিশোরীদের মতো কান্নাকাটি করে মায়ের কাছ থেকে তার আবদার পূরণ করে নিলেন। মা তাকে শাড়ি পরিয়ে দিলেন। শাড়ি পরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে খুব মনোযোগ সহকারে একাধিকভাবে নিজেকে বিভিন্ন পাশ থেকে দেখছেন।

আমি তখন আপুর ঘরে বসে ছিলাম। আপু তখন গুন গুন করে গান করছিলেন। আমাকে দেখে, কেমন লাগছে রে সুমন?

অপূর্ব, মনিষা কৈলারা তোমার কাছে ফেল করে যাবে আপু।

খুব পেকে গেছিস, না।

না আপু, তুমি বিশ্বাস করো, তোমাকে খুবই সুন্দর লাগছে।

এখন মনে হয় কথাটা বিশ্বাস করলেন। আমার মুখ থেকে প্রশংসা শুনে কিছুটা খুশি হলেন। এরপর ধমকের সুরে, হয়েছে, যা, তোর কাজে যা।

এ সময় মা ঘরে এসে, যা সুমি, তোর বাবা ঘরে বসে আছে। তাকে দেখিয়ে আয় গে।

আপু কিছুটা লজ্জা পেয়ে বললেন, না মা, আমার খুব লজ্জা লাগছে।

আরে পাগলি মেয়ে, বাবার সামনে যেতে আবার লজ্জা কিসের।

মায়ের এ কথা শোনার পর আপু কিছুটা সাহস পেলেন। বাবার সামনে গিয়ে দাড়িয়ে সালাম দিলেন।

এ সময় আমি ও মা আপুর সঙ্গে ছিলাম। আপুকে দেখে মায়ের উদ্দেশ্যে বাবা বললেন, আরে, দেখো সুমিকে খুব সুন্দর লাগছে না। আমাদের সুমিকে কতো বড় দেখাচ্ছে। শাড়িতে তোমাকে বেশ মানিয়েছে। অনেক মেয়ে আছে শাড়ি পরলে ভালো লাগে না। কিন্তু তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে।

এবার বাবার কাছ থেকে দ্বিতীয়বারের মতো প্রশংসা শোনার পর আপু খুব লজ্জা পেয়ে ঘরে চলে গেলেন। এ সময় আমি আর বাবা-মা ছাড়া ঘরে কেউ ছিল না। বাবাকে লক্ষ্য করে মা বললেন, দেখেছো, আমাদের সুমিকে নীল শাড়িতে কেমন মানিয়েছে।

হ্যা, তাতো দেখলাম।

একটা জিনিস খেয়াল করেছো, সুমিকে শাড়ি পরাতে অনেক বড় লাগছিল। আমার মনে হয় একটা ভালো পাত্র দেখে তার বিয়ে-শাদির চিন্তা করা দরকার।

বাবা কিছুটা বিরক্ত হয়ে, তোমার শুধু একটাই কথা। আগে ওর পড়াশোনাটা শেষ হোক, তারপর এসব ব্যাপারে চিন্তা করা যাবে। এখন যাও, তোমার কাজ করো। এ কথা বলে মাকে মিষ্টি ধমক দিয়ে বাবা তাড়িয়ে দিলেন।

তার পরদিন সকালবেলা। আপু খুব সকালে উঠে সাজসজ্জায় ব্যস্ত। পাশের বাসার ভাবী খুব ভালো শাড়ি পরাতে পারে। আপু তার কাছে শাড়ি পরতে গিয়েছেন। শাড়ি পরা হয়ে গেলে বাবা আমাকে নির্দেশ দিলেন আপুকে কলেজে রেখে আসতে। আমি বাবার কথা মতো কাজ করলাম।

আপুদের কলেজের অনুষ্ঠান শেষ হবে দুইটার সময় দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর্ব সেরে। দুইটা থেকে তিনটা, চারটা বেজে গেছে তবুও আপুর আসার কোনো খবর নেই। বাবা-মা খুব চিন্তা করছেন। মায়ের চোখে-মুখে কান্নার ভাব চলে এসেছে। আমার বাবার মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেছে। সামনে একটা ভয়াবহ বিপদ আসছে আন্দাজ করতে পেরে, আমি আর বাবা ছুটে গেলাম কলেজে। কলেজ তখন ফাকা। আপুর কলেজের প্ৰিন্সিপাল আপুকে খুব আদর করতেন।

তিনি বললেন, অনুষ্ঠান তো দুটাতেই শেষ হয়ে গেছে। সুমি বাসায় যায়নি? তবে গেল কোথায় মেয়েটা?

এ কথা বলে উপস্থিত সকলকে নির্দেশ দিলেন গোটা কলেজ খোজার জন্য। সমস্ত কলেজ খোজা হলো, আপুকে পাওয়া গেল না।

আপু নিখোজ হওয়াতে বাবার বেহুশ হওয়ার মতো অবস্থা। প্ৰিন্সিপালস্যার বাবার অবস্থা দেখে তাকে সান্ত্বনা দিলেন। সব বান্ধবী, আত্মীয়-স্বজনের বাসা খোজা হলো, আপুকে পাওয়া গেল না। অবশেষে সন্ধ্যার পর স্যারের পরামর্শ ও সহযোগিতায় থানাতে আপুর নামে নিখোজ-এর একটা ডায়রি করা হলো। এদিকে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে গেছে। তবুও আপু আর ফিরে এলো না। গোটা রাত বাবা মায়ের চোখে ঘুম নেই। নিকট আত্মীয় সান্ত্বনা দিচ্ছে। মা কান্না করছে, বাবা বাকরুদ্ধ। তবুও সান্ত্বনায় তাদের মনের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না।

সারা রাত প্রচুর বৃষ্টিপাত হলো। দুঃসহ সেই রাত এক সময় কেটে ভোর হলো। তবুও আপু বাড়ি ফিরলো না। বাবা-মা প্রায় পাগলের মতো হয়ে গিয়েছেন। সকালের সূর্য ওঠার আগেই আত্মীয়স্বজনেরা বের হলো চারদিকে আপুর সন্ধানে।

সকাল সাতটায় একজন এসে বললো, আপুকে পাওয়া গেছে।

মা দৌড়ে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় আমার সুমি?

লোকটা কিছু বলতে পারলো না। কিছুক্ষণ পর কান্নায় জর্জরিত হয়ে বললো, সুমিকে পাওয়া গেছে।

তবে সে আর জীবিত নেই, মারা গেছে। এ কথা শোনার পর মা জ্ঞান হারালেন।

আপুকে পাওয়া গেছে শহর থেকে বেশ কিছু দূরে খালের ধারে এক কুড়ে ঘরে। স্থানীয় আওয়ামী লীগের এক নেতার লম্পট ছেলে আপুকে অপহরণ করে সে ঘরে রাতভর আটকিয়ে রেখেছিল। সারা রাত ভরে চলে আপুর ওপর অমানবিক শারীরিক নির্যাতন। সারা রাত ভরে বৃষ্টি হওয়া, আপুর আতর্কিতকার, জীবন বাচানোর আকুতি কেউ শুনতে পায়নি। আর এ সুযোগে ওই লম্পট ছেলের ক্যাডার বাহিনী আপুর হাত পা বেধে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে এক পর্যায়ে তাকে হত্যা করে। ভোরবেলাতে এক কৃষক মাঠে গেলে ওই পশুর দলকে ঘর থেকে বের হতে দেখে। তখন তার সন্দেহ

হয়। এলাকাবাসীদের সহযোগিতায় ওই লোক তাদেরকে তাড়া করে। ওই ক্যাডার বাহিনী লাশ রেখে পালিয়ে যায়। ঘরে পড়ে থাকে হাত পা বাধা নীল রঙ-এর শাড়ি পরা এক তরুণীর লাশ। তার শাড়িটা ছিল রক্তে ভেজা। এটা হলো আমার হতভাগী বোন সুমিআপুর লাশ।

বাবা সব কিছু শোনার পর থানায় কেস করতে যাবে। কিন্তু স্থানীয় এক বড় আওয়ামী লীগের নেতা এসে বাবাকে বাধা দেয়। মেয়েটা তো গেছে, ছেলেটাকে আর হারিয়েন না। এ কথা বলে বাবাকে ভয় দেখানো হলো। ওই লোক আরো বললো, আমরা এখন ক্ষমতায়, থানা-পুলিশ সব আমাদের পকেটে। কেস করে অযথা পয়সা খরচ করবেন না। তাতে পয়সাও যাবে, জীবনও যাবে। তারপর বাবা আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে পরামর্শ করে আর কেস করলেন না।

সবচেয়ে দুঃখ লাগলো তখন যখন আওয়ামী লীগের লোকেরা নিজেদের দোষ লুকানোর জন্য আমার নিষ্পাপ বোনের নামে নানান রকম মিথ্যা অপপ্রচার চালালো এবং ওই সকল মিথ্যা বানোয়াট সংবাদ যখন পত্রিকায় তোলা হলো।

এরপর থেকে আমি হলুদ সাংবাদিকতাকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি। তার সঙ্গে ঘৃণা করি সন্ত্রাস নির্ভর, চাপাবাজির, আদর্শহীন রাজনীতিকে।

স্বজনহারার বেদনা কি তা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খুব ভালো করে বুঝতেন। তাই তিনি কথায় কথায় বলতেন, আইনের সুশাসন ছাড়া গণতন্ত্র উন্নয়ন সম্ভব নয়। কিন্তু যখন তার দলের চরিএহীন, লম্পট, সোনার সন্তানেরা আমার আপুর মতো সীমা, বুশরা এদেরকে পাশবিক নির্যাতনের পর নৃশংসভাবে হত্যা করলো, যখন রেপিস্ট দলের অধিনায়ক সোনার টুকরো মানিক জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির ভেনুতে ধর্ষণ খেলায় কৃতিত্বের সঙ্গে সেধুরি করলো এবং তার দলের সমর্থকগোষ্ঠি পটকা ফুটিয়ে, মিষ্টি বিতরণ করে আনন্দ উৎসব পালন করলো, তখন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর আইনের শাসন কোথায় ছিল? যদিও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নারী ছিলেন তবুও মনে হয় নারীর সম্ভ্রম হননের প্রতিযোগিতায় তার সোনার টুকরো মানিকের সাফল্যে তিনি আত্মহারা হয়েছিলেন। তাই তাকে আইনের কাছে সমর্পণ না করে বিদেশে পাঠিয়ে তিনি পুরস্কৃত করেছিলেন।

শেখ হাসিনা, বর্তমান বিরোধী দলীয় নেত্রী, আপনিও তো একজন মা। আপনার মেয়ের প্রতি আপনার স্নেহের কথা অজানা নয়। তাই এবারকার নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পর মেয়ের কাছেই ছুটে গিয়েছিলেন মাতৃত্বের টানে।

মেয়েকে মজার মজার রান্না করে দিয়ে এসেছেন। সে কথা আমাদের বলেছেন। তাতে আমরা দেশবাসী খুশি হয়েছি জেনে আপনি একজন স্নেহময়ী মা। আমার হতভাগ্য মায়েরও তো এ রকমই আশা ছিল। মেয়েকে বিয়ে দেবেন, মেয়ের বাড়িতে গিয়ে মেয়েকেসহ মেয়ের জামাই এবং নাতিদেরকে পিঠা খাইয়ে আসবেন। কিন্তু আমার মা কি আর কি তা পারবেন?

একটু কল্পনা করুন তো! আমার মায়ের আসনে যদি আপনি হতেন, আপনার কন্যা পুতুলের ভাগ্য (আল্লাহ না করুক) যদি আমার আপুর মতো হতো তখন কি আপনি আমার মায়ের মতো কষ্ট বুকে রেখে শুধু চোখের পানি ফেলতেন? নিশ্চয় না। তখন আপনি আইনের শাসনের জিকির তুলতেন।

তখন হয়তো আপনার চাপাবাজ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একশ হাত মাটির তল থেকে ওই অপরাধীকে তুলে আনতেন। কিন্তু আমার মা-বাবা কি পারছেন তাদের স্নেহের কন্যার নির্মম মৃত্যুর বিচার করতে। পারেননি।

পারেননি আপনার দলের ক্যাডারদের জন্য। আপনার দলের নেতাকর্মীদের দ্বারা নির্যাতিত সমাজের অধিকাংশ লোকের প্রতি সুবিচার না করে শুধু নিজের পিতা-মাতার হত্যার বিচার করে কি সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা যাবে?

তবে বর্তমান বিরোধী দলীয় নেত্রীর প্রতি আমার বিন্দুমাত্র অসম্মান বোধ নেই। কিন্তু ঘৃণা করি তার দলের চরিত্রহীন, লম্পট ক্যাডারদেরকে যাদের জন্য আমার আপুর মতো অসংখ্য নারীর মৃত্যু হয়েছে। আজকে যদি তিনি ক্ষমতায় থাকতেন তবে তার দলের ক্যাডার হয়তো আমাকেও আপুর ভাগ্যবরণ করিয়ে দিতো।

একই কথা বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আপনার দলেও সোনার মানিকের মতো, নওগা জেলায় সোনার জাহাঙ্গীর, উজ্জ্বলের উদ্ভব হয়েছে। এদের ব্যাপারে এখনই কঠোর হন। আর যেন মহিমার মতো অকালে কারো প্রাণ ঝরে না পড়ে। এখনই সতর্ক না হলে আপনাকে বর্তমান বিরোধী দলীয় নেত্রীর মতো দুর্নামের ভাগী হয়ে ক্ষমতা হারাতে হবে।

এখনো আমার মায়ের যখন আপুর কথা মনে পড়ে তখন আলমারি থেকে আপুর রক্তমাখা নীল শাড়ি বের করে পাগলের মতো কাদেন। কোনো কোনো সময় জায়নামাজে নামাজ পড়ার সময় আপুর নীল কাপড়টা বুকে জড়িয়ে আল্লাহ কাছে কান্নাকাটি করেন। রাষ্ট্রের আদালতে বিচার দিতে না পেরে মা এখন আল্লাহর আদালতে বিচার দেয়। তখন আমার বুক ফেটে কান্না চলে আসে। আমি ওই সময় ঘরে থাকতে পারি না। এমন তো হওয়ার কথা ছিল না!

রাজশাহী থেকে

আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করছি বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে এই রচনাটি পড়ার জন্য এবং তার দলীয় ক্যাডারদের আগাম শাসন করার জন্য।
-যাযাদি

ইন্টারনেটে

- আসাদুজ্জামান রিপন

আমরা ভেটেরিনারির ছেলেরা প্রায়ই আক্ষেপ করি, এখানে পড়তে এসে কিছুই পেলাম না। এখানে জিনিসপত্রের চড়া দাম। রিকশার দুস্প্রাপ্যতা (রিকশাচালককে বলতে হয় ড্রাইভার) এবং ভাষা সমস্যা তো রয়েছেই। কিন্তু ঢাকার সঙ্গে তুলনা দেয়ার মতো অনেক কিছুই এখানে আছে যার অন্যতম সভ্যতার আধুনিকতম সংস্কারণ ইন্টারনেট, সাইবার ক্যাফে। ইন্টারনেটের বিশাল জগতে যে একবার প্রবেশ করেছে সে মূলত পৃথিবীকেই জয় করেছে। যাই হোক। এতো সব ভণিতার কারণ আমার কাহিনীর পটভূমি ইন্টারনেট।

ডরোথি-র সঙ্গে আমার পরিচয়ের সূত্রপাত হয় ইন্টারনেটে চ্যাটের মাধ্যমে। যারা চ্যাট (Chat) সম্পর্কে জানেন না তাদের জন্য বলতে হয় চ্যাট হচ্ছে দুজনের কথার বিনিময় যা কমপিউটারে লিখে করা হয়।

অনেকগুলো নামের মাঝে তার নাম বেছে নেয়ার কারণ ছিল তার অদ্ভুত নাম শাড়ি (Saree)। প্রসঙ্গত বলতে হয়, চ্যাটে অনেকেই তার আসল নাম না দিয়ে ছদ্ম নামে চ্যাট করেন।

যাই হোক। মজা করার জন্য ডরোথিকে লিখি আমাদের দেশে এমন একটা জিনিস আছে যা মেয়েদের খুব প্রিয় আর তার মিল আছে তোমার নামের সঙ্গে।

কি সেটা? ডরোথি প্রশ্ন করে।

উত্তরে ঘুরিয়ে বলি, দেখি তোমার আইকিউ কেমন? তুমি চারটি প্রশ্ন করবে, এর মাঝে সঠিক রু হলে বলে দেবো।

সে বেশ মজা পেয়ে যায়। উত্তরে সে বলে, এটা কি খাওয়া যায়?... ইত্যাদি।

মজার ব্যাপার হলো, সে চতুর্থ উত্তরে সঠিক রুই বলে, এটা কি কোনো পোশাক?

আর এভাবেই ডরোথির সঙ্গে পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব। চ্যাটের মাধ্যমে তার আসল নামটি জেনেছি। আমার সম্বন্ধে, আমার কলেজ, পরিবেশ, পরিবার সম্পর্কে তাকে জানাই। ডরোথি জানায়, সে আইরিশ-আমেরিকান। তার জন্ম ডেনভারের ছোট শহরে। সেখানে সে তার মায়ের সঙ্গে আপাতত একটা ছোট গ্রোসারি চালাচ্ছে। সামনের ফলস সেমিস্টারে সে ইউনিভার্সিটিতে ফিরে যাবে। সে নাচতে খুব ভালোবাসে। বই পড়া এবং স্কি করা তার শখ।

প্রায়ই সাইবার ক্যাফেতে দুই এক সপ্তাহ যেতে পারতাম না হয়তো পরীক্ষা কিংবা অন্য সমস্যার জন্য। সে এর মাঝে দুই তিনটা ই-মেইল করে জানতে চাইতো আমি কবে তার সঙ্গে চ্যাট করতে পারবো? তার ফোন নাম্বার জানতে চাওয়ার ইচ্ছাকে প্রায়ই অন্যভাবে এড়িয়ে যেতাম। মজার ব্যাপার হলো, তার ই-মেইল কিংবা চ্যাটের কিছুটা অংশ জুড়েই থাকতো শাড়ি সংক্রান্ত প্রশ্ন।

শাড়ি দেখতে কেমন? কিভাবে পরে, আমি শাড়ি পরা একটি ছবি চাই, শাড়ি কি শুধুই মেয়েরা পরে, না পুরুষরাও পরতে পারে? ইত্যাদি।

তার শাড়ি সংক্রান্ত এতো আগ্রহ দেখে DHL কুরিয়ারের মাধ্যমে একটি শাড়ি পাঠিয়ে দিই। শাড়ি পেয়ে সে ভীষণ খুশি। ই-মেইলে সে জানায় শাড়ি পেয়েছে। কিন্তু পরতে পারছে না। আমি যেন তাকে জানাই কিভাবে পরতে হয়।

এর মাঝে অনেক দিন গেছে। একদিন ই-মেইল খুলে দেখি ডরোথি লিখেছে সে চায় আমি যেন ইউএসএ এসে তার সঙ্গে দেখা করি। সে একটা দামি উপহার নিয়ে বসে আছে আমাকে দেবে বলে।

উত্তরে বলি আমি যেতে চাইলেই তো হবে না। তোমার সরকার আমাকে ভিসা দেবে না। কাজেই দেখা করা অসম্ভব।

সে বলে যেহেতু আমি যেতে পারছি না সেহেতু সে আসবে।

কিন্তু আমি জানি তা অসম্ভব। কারণ সে যখন এ দেশে আসবে এবং আমাকে, আমার দেশকে দেখবে তখন তার মোহমুক্তি ঘটবে। আমাকে আর আমার দেশকে তার কাছে ছোট করতে পারি না। তাই ফন্দি করতে থাকি কি করে তাকে নিবৃত্ত করা যায়।

উত্তরে তাকে জানাই, দেখো, এ সময়ে আমাদের দেশে খুব ঝড়-বৃষ্টি আর বন্যা চলছে। কাজেই তুমি এসে কোথাও বের হতে পারবে না। বরং আমি জানাবো, কখন এলে ভালো হবে।

আমি জানি এভাবে তাকে আটকে রাখা যাবে না। তার সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে চুকিয়ে ফেলতে হবে এবং সেটাতেই মঙ্গল।

এই তো সেদিন ই-মেইল পাঠিয়েছে সামনের সামারে সে এ দেশে আসতে চায়। আমার সঙ্গে শাড়ি পরে ঘুরবে এবং তার কথা সে বলবে। আমি জানি না কিভাবে তাকে নিবৃত্ত করবো। আমাকে হয়তো শেষ চেষ্টা হিসেবে তার সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন করতে হবে। ভাবাবেগ নিয়ে জীবন চলে না। বাস্তব বড় নিষ্ঠুর।

riponcadet@yahoo.com

তবুও তাকেই

– তমা

গ্রামের স্কুলে পড়তাম। প্রথম না হলেও দ্বিতীয় পদটি ছিল সব সময় আমার পাওনা। গান, কবিতা আবৃত্তি, সাইকেল চালানো আর দুরন্তপনা কোনো কিছুতেই ভালোবাসার কমতি ছিল না আমার। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভালোবাসার লিষ্টে যোগ হতে থাকলো নতুন মাত্রা। নিজেকে আড়াল করার দিনে, নিজেকে জানার দিনে যা কিছুকে ভালোবাসা যায়, নিভৃত ঘরে শাড়ি, টিপ পরে একাকি আয়নায় দুজন হয়ে যাওয়া অথবা কারোর জন্য নিবিড় অপেক্ষা, আরো কতো কি!

একজনকে ভালোবাসতাম আর ভালোবাসতাম শাড়ি পরতে। শাড়ি পরে তার সামনে যেতে ভীষণ ভালো লাগতো। নিজেকে বৌ বৌ মনে হতো। একদিন নানুর বাড়ি বেড়াতে গেলে ও সেখানে আসে। দিনের বেলা কেউ দেখে ফেলার ভয়ে আমরা কথা বলতাম গভীর রাতে। রাতে সে এলো। শাড়ি পরে তার কাছে গেলাম। আমাকে জড়িয়ে ধরে সে বললো, তুমি আমার রানী, আমার লক্ষ্মী সোনাবৌ। ভালোলাগায় কেপে উঠলাম। সে আমার ঠোটে ঠোট রাখলো। সে ঠোট আরো বেপরোয়া হয়ে আমার সব লজ্জা ভেঙে দিল। ক্লান্ত, তৃপ্ত সে আমাকে বুকে তুলে নিল। আমি তার বুকে মাথা রাখলাম পরম নির্ভরতায়।

সে আমাকে ভালোবাসতো আমাকে বুঝতো। সে পড়াশোনা করতো ভারতের আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে আর আমি তখন এসএসসি-তে স্টার মার্কস পেয়ে ঢাকার একটি নামি কলেজে।

একদিন সে ইন্ডিয়া থেকে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। জানালা দিয়ে অন্ধকারে হাতড়িয়ে আমার হাতের মাঝে গুজে দিল একটা নরম কাপড়ের পুটলি। বললো, তোমার জন্য ছোট একটা উপহার শাড়ি।

লজ্জায় কুকড়ে গেলাম। আমি তো তার কাছে কিছু চাইনি। শুধু ভালোবাসা ছাড়া। শুধু তার ভালোবাসা, তার আদর, মন, শরীর জড়িয়ে থাকুক শাড়ির মতোই। এটুকুই আমি চাই। শাড়ির কি এমন যোগ্যতা যে, এই আদরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জিতবে?

তারপর একদিন তার দেয়া শাড়ি, কাজল, টিপ, জড়োয়া অলংকার জড়িয়ে তার বৌ সাজলাম তার সোনাবৌ হওয়ার আমন্ত্রণে। সবাই আমাকে তার রুমে এনে বসালো। আমার কাছে সব কিছু স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল। তার ঘর, তার এই সাজানো খাট, সিডি প্লেয়ার, তার ভুবনে আমার নতুন করে পদার্পণ। এ এক অন্য পৃথিবী। ভালোলাগায় ভালোবাসলাম আমার পতিদেবতাকে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষের আসনে বসলাম, পূজার আসনে বসলাম।

এক বছরের সংসার তখন আমাদের। ইতিমধ্যেই জীবনের অনেক বাস্তবতার মুখোমুখি হলাম। একদিন আমাকে জানালো, সে নাকি আমাকে করুণা করেছে বিয়ে করে। পৃথিবীর বিশাল আকাশটা মনে হলো এক্ষুণি ভেঙে পড়বে আমার ওপর। মনে হলো বিরাট এই পৃথিবীতে কোথাও আমার জন্য এক বিন্দু আশ্রয় নেই। তবুও দুই চোখ বুজে সব অপমান সহ্য করলাম। বিয়ের বাধনে বন্দী আমাদের মতো মেয়ের এছাড়া আর কিইবা করার আছে। প্রতিনিয়ত অনুভব করতে লাগলাম তার এই বদলে যাওয়া এবং অনুভব করলাম প্রতিদিনের এ আপন প্রিয় পৃথিবীটা কি করে বিষাদে ছেয়ে যায়। কি করে অফুরন্ত বাতাসের মাঝে দম বন্ধ হয়ে আসে। তারপরও ভাবিনি আমার জন্য অপেক্ষা করছে আরো অনেক বড় যন্ত্রণা।

সেদিন জানলাম সে অন্য নারীতে আসক্ত। বৃষ্টির রাতে অপেক্ষা করতাম তার জন্য আমার সমস্ত আকুতি দিয়ে। আর সে অন্য একজনের বুকে সুখনিদ্রায় রাত কাটাতো। মাঝে মধ্যে দুঃস্বপ্নে কেদে উঠতাম ঘুমে। জেগেই চারপাশে খুজে পেতাম কেবল নিবিড় একাকীত্ব আর দুঃসহ হাহাকার। তারপরও বেচে আছি। পৃথিবীর নিয়মে এরপরও বেচে থাকতে হয় আমাদের মতো অসহায় মেয়েদের। তবুও অবিশ্বস্ত পুরুষকেই অবলম্বন করতে হয়।

এক বছর প্রায় সে প্রবাসে আছে। দায়সারা গোছের খোজখবর রাখে। এবং আমি শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা আর সংসারের দায়িত্ব পালন করছি। যে মেয়েটির নেশা ছিল গান গাওয়া আর কবিতা আবৃত্তি সে আজ রবীন্দ্রনাথের আমি তোমার সঙ্গে বেধেছি আমার প্রাণ, সুরের বাধনে গানটি শুনে আংকে উঠি ভয়ে ও ঘৃণায়। কারণ সে জানে সুরের তারে বাধা প্রাণ বড্ড নিষ্ঠুর, বড্ড যন্ত্রণার। শুনেছি শেষদিকে সে নাকি গাজাও ধরেছিল। বড় কষ্ট হয় তার জন্য। আমার ভালোবাসায় কোথায় এমন অপূর্ণতা ছিল যে, সে এমন করে বদলে গেল? তবুও তাকে ভালোবাসি। তাকে যে আমি পেয়েছি অজানা সাধনে! তাই নিজেকে সরিয়ে নিতে চাই। তাকে মুক্তি দিতে চাই। আমার একটা অবলম্বনের বড্ড প্রয়োজন। দুঃখ, হতাশা এবং এই তিক্ততা আজ জড়িয়ে আছে আমায় ঠিক যেন শাড়ির মতো।

গাজীপুর থেকে

সুখস্মৃতি

- নাদিরা-দিল-বারী মুন্নী

১৯৯৭ সাল। তখন সবে অনার্স পরীক্ষা শেষ করেছি। ইচ্ছা মতো হেসে-খেলে জীবন পার করছি। হঠাৎ একদিন শুনলাম, আমার জন্য একটা খুব ভালো বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। তবে ছেলে আগে মেয়েকে দেখবে, মেয়ে তারপর ছেলেকে দেখবে। উভয়ের পছন্দ হলে বিয়ের কথা এগোনো হবে।

যথারীতি সময় ঠিক করা হলো। ছেলের অফিসে গিয়ে সরাসরি দেখা করবো। আর অবশ্যই সঙ্গে আমার মা-বাবা থাকবেন। আমার ছোটমামা বিয়ের ঘটক। তিনি কাজে আটকে যাওয়ায় ছোট মামি যাবেন। সময় এলো ঘনিয়ে। আমার শখ ছিল শাড়ি পরার। শাড়ি পরে রওনা হলাম।

দূর দূর বুকো ছেলের অফিসে পা রাখলাম। বসা এবং কফি খাওয়া হলো অফিসের এক রুমে। আমি এক ফাকে ছেলেকে দেখে নিলাম খুব ভালো করে। কারণ বাসা থেকে আমার অন্য মামিরা আমাকে ছেলের চুল থেকে নখ পর্যন্ত পুজ্ঞানুপুজ্ঞ রূপে দেখতে বলে দিয়েছিলেন। যদিও ছেলের খালা বিয়ের ঘটক হিসেবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন তবুও আমার কর্তব্যে বিন্দুমাত্র অবহেলা করিনি। অর্থাৎ পুজ্ঞানুপুজ্ঞ রূপেই তাকে দেখার চেষ্টা করলাম।

তারপর আমার ঘটক মামার ফোন এলো বাসায়। মামা বললেন, ছেলে নাকি প্রথমে বুঝতেই পারেনি মেয়েকে। কেননা ওখানে যদিও মেয়ে, মেয়ের মা, ছোট মামি এই তিনজন ছিলেন। কিন্তু তিনজনই শাড়ি পরার দরুণ আর মেয়ের ছোট মামির (কম বয়সী হওয়ায়) ছোট ছোট চুল থাকার কারণেই সম্ভবত ছেলে প্রথমে ভুল করে তাকেই মেয়ে ভেবে বসেছিল। তারপর একটু পরে মামির ছেলেটা যখন আম্মু বলে ডাক দিয়ে তার কাছে গেছে তখন ছেলের টনক নড়ে। আরে! এ আমি কাকে মেয়ে ভাবছি। যাহোক, তারপর সে আমার দিকে তাকায়।

কিছুদিনের মধ্যেই আমার আকদ হয়ে যায়। আর পরের মাসেই আমার বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে বলে ঠিক করা হয়। তার সঙ্গে আমি চুপি চুপি কয়েকবার দেখা করলাম। আর তখনো সেই সমস্যা। শাড়ি পরবো, নাকি সালোয়ার কামিজ? যদিও আমার প্রিয় ছিল শাড়ি। কিন্তু আমি তা পরলাম না। কেননা আমাদের প্রথম দেখাতেই শাড়ি পরে যে কাণ্ডটা হলো!

বিয়ের শাড়িটা এমনিতে খুবই সুন্দর ছিল। কিন্তু এতো ভারী যে, আমার খুব অস্বস্তি লাগছিল। মেয়েদের বিয়ের সময়ে এক আলাদা টেনশন থাকে। তার ওপর আবার এই ভারী শাড়ির অস্বস্তি।

বিয়ের সব আচার-অনুষ্ঠান যখন শেষ হলো তখন শ্বশুরবাড়িতে বাসরঘরে বসে আছি ঘোমটা টেনে। সেই সময়টাতে খুবই ক্লান্ত ছিলাম। এতোটুকুও শক্তি পাচ্ছিলাম না নড়াচড়া করার। এরপরে যা হলো তাই আমার জীবনের সবচেয়ে সুখস্মৃতি হয়ে রইলো।

স্বামী ঘরে ঢুকেই আমাকে বললো, তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে, তুমি একটুও নড়বে না, আমি সব ব্যবস্থা করছি।

এই কথা বলে সে আমার খোপার কাটা খুলতে শুরু করলো। আন্তে আন্তে আমার সব গয়না খুলে গুছিয়ে রাখলো। তারপর আমার সেই খুবই সুন্দর ভারী বিয়ের শাড়িটা ভাজে ভাজে খুলতে লাগলো।

এতো ক্লান্তির মাঝেও আমার মনে হতে থাকলো, হে আল্লাহ! আমার এই সুখের মুহূর্তের কথা তুমি আমাকে মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্তও মনে করিয়ে রেখো, যেন মৃত্যুর স্পর্শ পাওয়ার আগ মুহূর্তেই আমার এই সুখস্মৃতি আমার মনের মধ্যে ভেসে ওঠে।

উত্তরা, ঢাকা থেকে

বিষের পেয়ালা

– এপি

পড়ালেখার পাশাপাশি ভালো খেলোয়াড় হওয়ার সুবাদে খুব অল্প বয়স থেকেই নিজেকে বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকতে হয়েছে। এসবের বেশির ভাগই ছিল গ্রাম কেন্দ্রিক। এসএসসি পরীক্ষার পর ঢাকায় পড়াশোনা করলেও ছুটির দিনগুলো কাটতো গ্রামের ছায়া সুনিবিড় পরিবেশে। আমাদের গ্রামের সমাজকল্যাণ ক্লাবটির আমি তখন একজন কর্মকর্তা। এইচএসসি-র রেজাল্টের পর বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষা দিছি। এমন সময় একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের উদ্দেশ্যে আমার গ্রামে যাই।

একুশে ফেব্রুয়ারির খুব সকালবেলা আমার পার্শ্ববর্তী বাড়ির বন্ধুটির জন্য রাস্তায় দাড়িয়ে অপেক্ষা করছি। পূর্ব আকাশে সূর্যটি কেবল উকি মেরেছে। নীল শাড়ি পরা একটি মেয়ের ছন্দময় আগমনের দৃশ্যটি দেখে আমার পরবর্তী কার্যক্রমের কথা বেমালুম ভুলে গেলাম। ভালো ছাত্র হওয়ার সুবাদে বিভিন্ন সময় মেয়েদের কাছ থেকে প্রেমপত্র পেয়েছি এবং অনেককে আবার ভালোও লেগেছিল। কিন্তু কখনোই সাড়া দিইনি। ভাবতাম, আগে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিই তারপর এসব প্রেম বিষয়ে ভাববো।

কিন্তু নীল শাড়ি পরা মেয়েটি যতোই আমার দিকে এগিয়ে আসছে, আমার ভাবনার দেয়াল ততোই যেন সরে যাচ্ছে। সকালের এই হালকা রোদে মেয়েটিকে আমার কাছে পৃথিবীর সব সুন্দরের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী মনে হতে লাগলো। কাছে আসতেই তাকে নাম জিজ্ঞাসা করলাম। ভয় এবং লজ্জা মিশ্রিত কণ্ঠে মেয়েটি উত্তর দিল। নাজ্জা পায়ে তার প্রস্থানের দৃশ্য উপভোগ করছি। এমন সময় পেছন থেকে বন্ধুর ডাকে হতচকিত হয়ে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে রওনা হই।

পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং র্যালিতে সব সময় মেয়েটির কাছাকাছি থাকতে চেষ্টা করি। উদ্দেশ্য ছিল মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এক পর্যায়ে আলোচনা অনুষ্ঠানে আমার বক্তৃতার পালা। যথারীতি মঞ্চে উঠি। কিছুক্ষণ বক্তৃতার পর মেয়েটির চোখে চোখ পড়তেই সব কিছু গুলিয়ে ফেলি। বন্ধুরা তো হতবাক হয়ে সব দেখছে। কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। নিজেকে সামলে নিয়ে বক্তৃতা শেষ করি।

মঞ্চ থেকে নেমে তার সঙ্গে কথা বলার জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করি। এক পর্যায়ে সফল হই। কয়েকদিন পর ঈদ। সে আমাকে নিমন্ত্রণ করলো। বলেছিলাম, নীল শাড়িতে তোমাকে খুবই সুন্দর দেখায়। ঈদের দিন তোমাকে শাড়ি পরতে হবে। আমার কথা সে রেখেছিল। সেই থেকে দুজন দুজনকে ভালোবাসতে শুরু করলাম।

ভর্তি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে না পেরে পাস কোর্সে ডিগ্রি পরীক্ষা দিলাম। রেজাল্ট ভালো হলে কি হবে হতাশায় পেয়ে বসলো নিজেকে। এরই মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাবা-মা আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। তারা সিদ্ধান্ত নিলেন, আমাকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হবে। আমিও তাদের সিদ্ধান্তে অমত করতে পারলাম না। সব কিছু ঠিক হলে আমি আমার ভালোবাসার মানুষটিকে বিয়ের প্রস্তাব দিই। সবার অজান্তে হবে জেনে সে রাজি হলো না। সে বলেছিল, আমি অনন্তকাল তোমার জন্য অপেক্ষা করবো।

সে তার কথা রাখতে পারেনি। আমি গৃহে আসার তিন মাসের মাথায় তার বাবা মায়ের মতামতের কাছে সে পরাজিত হয়েছিল। সাড়ে তিন বছর পর দেশে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি। সে চোখের জলে তার কাহিনীর বর্ণনার দিয়ে বলেছিল, তোমাকে হারানোর চেয়ে ভালোবাসার কষ্ট আমার বুকে আজীবন জ্বলবে। উপহার হিসেবে দিয়েছিল, লাল বেনারসি পরা তার এক কপি ছবি।

সব হারালেও তার দেয়া লাল বেনারসি শাড়ি পরা ছবিটি এখন আমার জীবনে আমার ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। নীল বিষের পেয়ালা এবং তার ছবি এ দুই-ই এখন আমার খুব কাছের বন্ধু।

এথেন্স, গ্রুস থেকে

হারানো চেতনা

- আবদুল খালেক

চাকরির প্রথম দিকে মফস্বলে আমার পোস্টিং ছিল। কর্মস্থলে মহিলা সহকর্মীদের আধিক্য ছিল এবং এটা হওয়ার উদ্দেশ্য ছিল কাজের প্রকৃতিগত কারণে। কোনো এক অসতর্ক বা অসচেতন মুহূর্তে এক সহকর্মীর প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ পায়। অবশ্য এই দুর্বলতা অপ্রকাশিত ছিল। এক সময় ঈদের ছুটি হলো এবং ঢাকায় এলাম ঈদ উপলক্ষে। বাসার সবার জন্য ঈদের কেনাকাটা করছি। চাকরির পর প্রথম ঈদ। তাই সবার জন্য কিছু না কিছু কিনতে হচ্ছে। কেনাকাটার এই ভিড়ে অবচেতন মনে এক অসাধারণ শখ জেগে উঠলো।

একটি শাড়ি কেনার খুব শখ হলো। তবে বাসার কারোর জন্য নয়, যাকে ঘিরে দুর্বলতার জন্ম তার জন্য। কাজটা কেমন হবে, ভালো না মন্দ বিস্তারিত ভাবনায় দিশাহারা হয়ে গেলাম। কিনে রাখবো কোথায়, দেবো কিভাবে, নেবো কি না, নিলে কিভাবে নেবে, হাজারো প্রশ্নের বাণে বিদ্ধ হতে লাগলাম।

বুঝি নিলাম এবং শেষ পর্যন্ত শাড়ি একটা কিনেই ফেললাম। শাড়ি কিনে পড়লাম মহাবিপদে। বাসায় যদি ঘুণাক্ষরেও টের পায় তাহলে আমার আত্মহত্যা করা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ থাকবে না। আমার পরিবারের মধ্যে, বিশেষ করে আমার ছোট বোন ও ছোট ভাইয়ের স্ত্রী এ দুজন যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি বিশ্বাস করে মেয়েঘটিত কোনো ঘটনা আমার দ্বারা কখনো কালেও হতে পারে না। তাদের এই অগাধ বিশ্বাসে কোনো অবস্থাতেই চিড় ধরানো যাবে না। তাহলে উপায়?

কোনো বন্ধুর বাড়িতে রাখবো সেটাও সম্ভব হচ্ছে না। গোমর ফাস হয়ে যাবে। বিপদেই পড়লাম। উপায়সূত্র না দেখে সিদ্ধান্ত নিলাম অত্যন্ত চুপিসারে বাসায় গিয়ে আমার ট্রাভেল ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখবো। চিন্তা অনুসারে বাসায় এসে ট্রাভেল ব্যাগে ঢুকিয়ে উপরে কিছু পরনের কাপড় আর অফিসের কাগজপত্র ভরে রাখলাম। এবং সবাইকে সাবধান করে দিলাম, কেউ যেন ব্যাগ না ধরে, এর মধ্যে মূল্যবান অফিশিয়াল কাগজপত্র আছে। ব্যাগটি চোখে চোখে রাখলাম। সারাক্ষণ ভয়ে থাকি এই বুঝি দেখে ফেললো। আমার অস্থির মনোভাব তাদের দৃষ্টি এড়ালো না। এক পর্যায়ে জিজ্ঞাসা করেই ফেললো, এমন নার্সাস দেখাচ্ছে কেন তোমাকে?

বুকে সাহস এনে বললাম, কোথায়, কিসের নার্সাস, তোরা ভুল বুঝছিস।

মনে সন্দেহ দানা বাধলো, দেখে ফেললো নাকি? ছুটি শেষ। যাবার প্রস্তুতি। ব্যাগ গুছিয়েছি এবং সাবধানে। ভোর হলে রওনা দেবো। কোনো রকম রাতটি কাটাতে পারলেই হলো। এক পর্যায়ে তারা দুইজন এসে বললো, ভাইয়া, তোমার ব্যাগটি গুছিয়ে দিই আর কিছু বাকি থাকলে দিয়ে দেবো।

আমার সব কিছু ঠিক আছে বলে তাদের যেতে বললাম। কিন্তু নাছোড়বান্দার মতো ব্যাগ দেখবেই। আমার ভেতরে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। তাদের মতিগতি ভালো মনে হচ্ছে না।

আমার নার্সাসনেস স্পষ্ট হতে লাগলো। তাদের ধমক দিয়ে বললাম, যা এখান থেকে।

যাচ্ছি। তবে দেখে নাও, ভালো করে তোমার ওই জিনিসটি ঠিক আছে কি না।

আমার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

আবার বললো, তোমার পছন্দ ভালোই। বলে মুচকি হেসে চলে গেল।

এরপর আমার অবস্থা কি হয়েছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ভোর হতে না হতেই চোরের মতো পালিয়ে বাচলাম।

কর্মস্থলে ফিরে এসে পড়লাম নতুন ফ্যাসাদে, শাড়িটি কিভাবে দেবো? যদি কেউ দেখে ফেলে, যদি ফিরিয়ে দেয়, যদি সবাইকে বলে দেয় এমনি ভাবনায় পাগল হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। স্থির করতে পারছি না কি করবো। অথচ মনে আবার অনুরাগের ছোয়া ঠিকই আছে। ভাবনা-কল্পনা সব কিছু আবেগে আপ্লুত হয়ে গেল। ঠিক করলাম, শখ করে যখন কিনেছি, কষ্ট করে যখন এনেছি, বাসাতেও যখন ইজ্জত গিয়েছে তাহলে আর ভাবনা নয়, দিয়েই দেবো। সবার অগোচরে দুনিয়ার সমস্ত শক্তি জোগাড় করে তার হাতে প্যাকেটটি তুলে দিলাম। প্যাকেটটি যখন দিই তখন এতোটাই নার্সাস হয়ে পড়েছিলাম যে, আমি নিজে কি করছি। সমস্ত অনুভূতি মুহূর্তের জন্য লোপ পেয়ে গেল। সখবিৎ ফিরে পেলাম তার কণ্ঠ শুনে। আর চেতনা হারিয়ে ফেললাম যখন সে বললো, আপনার প্রতি আমার ধারণা অন্য দশজনের চেয়ে ভিন্ন ছিল, সুন্দর ছিল। কিন্তু এখন দেখছি আপনি ব্যতিক্রম কিছু নন।

এরপর কি বলেছে না বলেছে কানে কিছুই ঢোকেনি। পালানোর পথও হারিয়ে ফেললাম। শাড়ির বিড়ম্বনা যে এতো ভয়াবহ হতে পারে আমার মতো ভুক্তভোগী না হলে তা অনুভব করাটা দুঃসাধ্য। শাড়ির বিড়ম্বনা, অনুশোচনায় ভীষণভাবে দগ্ধ করেছে তা আজো বিদ্যমান।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে